সূচিপত্র

ত্রৈমাসিক
নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রকাশনা

বর্ষ: ১৬, সংখ্যা: ১ম, জানুয়ারি - মার্চ ২০২৬

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ
জাকির হোসেন
বাসন্তি সাহা
মোসাম্মৎ লাকী আক্তার
সুলতান মো: সালাউদ্দিন সিদ্দিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ফয়সাল এজাজ রিসান

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ
ডি. এস. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৩৪/ ডি,
নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

যোগাযোগ
ফোন: ৪৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স: ৪৮১২১৪৫৫
মোবাইল: ০১৭১৩১৩১৩৪৮,
০১৭১৩০৮১৮৫২
ই-মেইল: nupublication2012@gmail.com

২০২৫ সালের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি: সংকট, সম্ভাবনা ও শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতা

বিগত চার দশকে ৫৭ হাজার ২১৬ জন প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফিরেছে। এর মধ্যে গত এক দশকেই ৩৮ হাজারের বেশি। অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, আত্মহত্যা, কর্মস্থল দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। মৃত্যুবরণকারী অভিবাসীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা অথবা হত্যার শিকার হয়েছেন। ২০২৪ সালে মোট ৪ হাজার ৮১৩ জন অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফিরেছে। এর মধ্যে ৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৩ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। এই পরিসংখ্যান অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ, মানসিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাবকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তাই বিদেশগামী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা ও মানবিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

চা-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার: অতীতের ক্ষত ও বর্তমানের দাবি

ব্রিটিশদের মিথ্যা প্রলোভনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা (১৮৩৪-৩৫) চা-শ্রমিকরা ব্রিটিশ চা-বাগান মালিক কর্তৃক অত্যাচার-নিপীড়ন, অবহেলা-নির্যাতন সইতে না-পেরে ১৯২১ সালের এই দিনে নিজ মুল্লুকে (আবাসভূমিতে) ফিরে যাওয়ার জন্য 'মুল্লুকে চলো আন্দোলন' সংঘটিত করেছিল। যেহেতু তাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না, তাই হেঁটেই সিলেট থেকে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাট পর্যন্ত আসে। এখানে ব্রিটিশরা তাদেরকে বাধা দেয়। বাধা অতিক্রম করে চা-শ্রমিকরা মেঘনা নদী পার হয়ে নিজের মুল্লুকে যেতে চাইলে ব্রিটিশ গুর্খা বাহিনী তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং হাজার হাজার চা-শ্রমিককে পেট কেটে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। চা-শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয় মেঘনা নদীর পানি।

যা আছে

পারিবারিক সহিংসতা ও কয়েকটি প্রশ্ন ০৩

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কতদূর? ০৬

২০২৫ সালের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি: সংকট, সম্ভাবনা ও শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতা ১০

মুল্লুকে চলো আন্দোলন: চা-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার: অতীতের ক্ষত ও বর্তমানের দাবি ৩৩

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দরিদ্র মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development) অপরিহার্য।

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো, পরিবারে-সমাজে রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশে এই চিত্র এখনও আশাব্যাঞ্জক নয়। একদিকে, আমরা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন-এর জন্য কাজ করছি অন্যদিকে, চার দেয়ালের ভেতরে 'পারিবারিক নির্যাতন' নামক এক অদৃশ্য ক্ষত নারীর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও আইনি সুরক্ষার অভাবও নারীর অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিচ্ছে।

জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নানা আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ সবখানেই নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কতটুকু বেড়েছে! ২০২৬ এর নির্বাচনেও যেসকল নারী নেতৃত্ব সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তারা প্রায় সবাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরিবার বা পারিবারিক বলয় থেকে এসেছেন। ফলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এখনও পুরুতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০২৪-এ জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেসব নতুন নারী নেতৃত্ব আশা জাগিয়েছিলেন তারাও বেশিরভাগই এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন।

২০২৫ সালে অন্তবর্তীকালীন সরকার কর্তৃক বহুল আলোকিত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারির মাধ্যমে দেশের শ্রম আইনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ, ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছরে নামিয়ে আনা, ছুটি বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার মতো বিষয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মানদণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। যা একটি ইতিবাচক বার্তা দেয়।

কিন্তু ২০২৫ সালের সংশোধিত আইনেও চা শ্রমিকদের প্রতি হওয়া চলমান বৈষম্যগুলোর কোনো সুরাহা করা হয়নি। সবচেয়ে বড় সংকটটি লুকিয়ে আছে তাঁদের আবাসন ও ভূমির অধিকারের মধ্যে। বংশপরম্পরায় প্রায় পৌনে দুইশত বছর ধরে এই ভূখন্ডে বাস করেও চা শ্রমিকদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। বর্তমান আকাশচুম্বী মূল্যস্ফীতির বাজারে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখনো অত্যন্ত অমানবিক। ২০২৫ সালের আইনে ৩ বছর পর পর ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার যে চমৎকার আইনি বাধ্যবাধকতা আনা হয়েছে, তা যেন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। চা শ্রমিকদের ভূমির অধিকারের স্বীকৃতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ছুটি ও রেশন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল ২০২৫ সালের শ্রম সংস্কারের সত্যিকারের সাফল্য অর্জিত হবে।

বাংলাদেশের ২০২৬-২৭ সালের বাজেটের শিরোনাম 'একটি মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে, মানুষকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সংস্কার করতে হবে; নারী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে গুণগত সেবা পৌঁছে দিতে হবে ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা ও কয়েকটি প্রশ্ন

বাসন্তি সাহা

১.

পারিবারিক সহিংসতা কতটা ভয়াবহ এই দেশে?

অস্থির এক সময়। ঘরে বাইরে নিরন্তর অসহিষ্ণুতায় তা প্রতিফলিত হচ্ছে। 'ইকরা' বলে একজন নারী সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে তার অভিনেতা স্বামীর বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কের কথা সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

গতবছর এপ্রিল মাসে বাজার থেকে পুঁটিমাছ কিনে এনে স্ত্রীকে কুটতে বলেন স্বামী কিন্তু স্ত্রী পুটিমাছ কুটতে না চাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামী স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। হত্যার পর স্বামী বাছির উদ্দিন (৩৫) নিজেই থানায় হাজির হয়ে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

এমন ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। ২০২৫ সালের প্রথম ৭ মাসে বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতায় মৃত্যু হয়েছে ৩২২ জনের। এর মধ্যে ২০৮ জন নারী ও শিশু। আত্মহত্যা করেছেন ১১৪ জন। সবচেয়ে বেশি হত্যার ঘটনা ঘটেছে স্বামীর হাতে-১৩৩ জন নারী। (ডেইলিস্টার অক্টোবর ১৬, ২০২৫).

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে অন্তত ৩২জন নারী ও কন্যাশিশু হত্যার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

এই যে বছরের পর বছর ধরে এই সহিংসতা ঘটছে, কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না, এর কারণ কী? এর শেকড়টা আসলে কোথায়?

২.

কেন বাড়ছে পারিবারিক সহিংসতা?

মনোবিদদের মতে, আত্মহত্যা হঠাৎ বা একদিনের সিদ্ধান্ত নয়, ছোটবেলা থেকে নারীর যে সামাজিকিকরণ সেখানে নানারকম অবদমন থাকে, না পাওয়া থাকে। ছোটবেলা থেকেই নারী দেখে যে তার চেয়ে তার ভাইটি অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে, বাবা পরিবারে সবচেয়ে ক্ষমতাবান, বিয়ের পরে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার আগেই শেখানো হয় কিভাবে মানিয়ে

নেবে। বিবাহিত একজন মেয়ে নির্যাতিত হলে তার নিজের পরিবার থেকে কোনো সহায়তা পায়না ফলে সহ্য করতে করতে একটা সময় খাদের কিনারে চলে আসে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

পারিবারিক সহিংসতার ধরণ নিম্নবিত্ত, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সবখানেই একইরকম মারধর, মানসিক অত্যাচার এমনকি খুন পর্যন্ত। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তদের ঘটনাগুলো প্রকাশ পায় যখন এটা আত্মহত্যা বা হত্যার মতো ঘটনা ঘটে। তখন প্রতিবেশী, বন্ধু স্বজনদের কথা থেকে বের হয়ে আসে এই অত্যাচার সে অনেকদিন ধরে ভোগ করছে, পরিবারকে জানিয়ে ছিল কিন্তু সন্তান, সংসার রেখে বের হয়ে আসতে সাহস পায়নি।

দরিদ্র পরিবারে অভাব আর মারামারি কাটাকাটি নিত্যসঙ্গী। স্বামী যেহেতু আয় করে, কঠোর পরিশ্রম করে তাই তার অধিকার আছে স্ত্রীকে মারধর করার। এমনকি স্ত্রীরাও সেটা বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশে প্রায় ৭৫ভাগ নারী তার জীবনের কোনো না কোনো সময়ে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন।

ড. শাহনুর শারমিন, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বলেন, এই সহিংসতা কেন বাড়ছে? এর কারণগুলো আগে খুঁজে বের করতে হবে। কেন মানুষ এমন নিষ্ঠুর অমানবিক হয়ে যাচ্ছে? শিক্ষায় যেমন বহুধারা শিশুদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে তেমনি পরিবারেও নৈতিকতার চর্চা নেই। ফলে নারীর প্রতি অবমাননা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ নারী কেউ নিরাপদ নয়, সম্প্রতি আমরা ইরাকে মরে যেতে দেখলাম, এর আগে আসিয়াকে দেখেছি। আরও অনেককে দেখেছি। কী বলবো!! দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। নাকি আইনের যথাযথ প্রয়োগ দরকার!! তার আগে মানুষগুলোকে ঠিক করতে হবে। মানুষ ঠিক না হলে আইন শাস্তি কিছুই কাজে আসবে না।

তিনি আরও বলেন, নারীর জন্য সমাজ

তো কোনো সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেনি, নারীর আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার জন্য নানারকম নিয়ম তৈরি করা হয়েছে ফলে নারীর মনোজগতে একধরণের হতাশা তৈরি হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে বড় হয়ে একজন নারী-পুরুষ উভয়ই সুযোগ পেলে তার ক্ষমতার চর্চা করতে চায়, আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেক্ষেত্রে পরিবারের নারী বা স্ত্রী বা কন্যাশিশু হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগের সবচেয়ে সহজ শিকার।

৩.

পারিবারিক সহিংসতাগুলো কেমন?

প্রতিদিনের জীবনের নানারকম টানাপোড়েনের মধ্যে নারী কি তার বিরুদ্ধে হওয়া সহিংসতাকে আলাদা করতে পারে, নাকি এটাকেই স্বাভাবিক মনে করে? পারিবারিক সহিংসতা বলতে বোঝায় পরিবার বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, যৌন বা অর্থনৈতিক নির্যাতন। এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা, কিংবা অভিভাবকের দ্বারা সন্তানের ওপর সংঘটিত হতে পারে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সহিংসতার শিকার হচ্ছেন নারীরা। তবে পুরুষ ও শিশুরাও অনেক সময় নির্যাতনের শিকার হন, যদিও তারা সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে বিষয়টি প্রকাশ করতে চান না। পারিবারিক সহিংসতা হতে পারে- ১. শারীরিক সহিংসতাঃ মারধর, চড়-থাপ্পড়, গলা টিপে ধরা, আগুনে পোড়ানো ইত্যাদি। ২. মানসিক সহিংসতাঃ গালিগালাজ, অপমান, হুমকি, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ৩. যৌন সহিংসতাঃ জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা যৌন নির্যাতন। ৪. অর্থনৈতিক সহিংসতাঃ ভরণপোষণ না দেওয়া, উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করা। অনেক ক্ষেত্রেই এই সহিংসতা দীর্ঘমেয়াদি ও পুনরাবৃত্তিমূলক হয়। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন কখনো কখনো আত্মহত্যার পথও বেছে নেন।

নানাকারণে পারিবারিক সহিংসতা ঘটতে পারে। কেবল দারিদ্র অশিক্ষা কে এক্ষেত্রে দায়ী করলে বিষয়টিকে সরলীকরণ করা হয়। কারণ আমাদের পার্বত্য জেলাগুলোতে দারিদ্রও আছে অশিক্ষাও আছে কিন্তু পারিবারিক নির্যাতন কম। কারণ এই সমাজে নারীদের অবস্থান দুর্বল নয়, অসম্মানের নয়। এসব পরিবারে নারীর পরিশ্রম দৃশ্যমান ও পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান স্বীকৃত । ফলে নারী হয়ে জন্ম নেয়া এই সমাজে অপরাধ নয়।

এছাড়া পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, পরিবার ও সমাজের নীরবতা, আইনের প্রয়োগ না থাকা ইত্যাদি কারণেও নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রতি পারিবারিক নির্যাতন বেড়ে যেতে পারে।

৪.

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে কী কী আইন রয়েছে?

বাংলাদেশ সরকার পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য হলো পারিবারিক-সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। এই আইনের মাধ্যমে নির্যাতিত ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে সুরক্ষা আদেশ পেতে পারেন। কিন্তু এই আইন এখনও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনও কার্যকর রয়েছে। তবে আইন থাকা সত্ত্বেও যথাযথ প্রয়োগের অভাব, সামাজিক চাপ এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা বেশিরভাগ সময় ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে।

'পারিবারিক-সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০' আইনটি নিয়ে কাজ করেছেন 'আমরাই পারি' এর প্রধান নির্বাহী জিনাত আরা হক। তিনি বলেন, আইনটির লক্ষ্য নারীদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা করা, প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেয়া নয়, ফলে এই আইনে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্তর নামে মামলা বা গ্রেফতার করা যায় না। ফলে এটা করতে ভুক্তভোগী বা তার আইনজীবি উৎসাহিত হন না। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মহিলা অধিদপ্তরকে কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে, বাজেট দিয়ে পদায়ন করা হয়নি। ফলে নারীদের সংহিসতা থেকে সুরক্ষার আইনটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। ফলে মাঠ পর্যায়ে এর ব্যবহার সীমিত রয়ে গেছে।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোট এর আহ্বায়ক এবং ব্যবস্থাপক (আইনগত সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, বশক) এ্যাডভোকেট মিতালী জাহান বলেন, আইনটি পাশ হয়েছে প্রায় ১৬বছর কিন্তু এখনও আইনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ জানেন না। আইন-টি ব্যবহারের দিক থেকে কিছু অস্পষ্টতা ছিল। অন্তর্বতীকালীন সরকারের সময়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কিছু এ্যামেনমেন্ট আনা হয়েছে। পত্রিকা থেকে জেনেছি, এটা ক্যাবিনেটে পাশ হয়েছে। আশা করছি, আগামী সংসদে এই এ্যামেনমেন্ট পাশ হয়ে গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে।

পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য সরকারি পর্যায়েও নারী ও শিশু সহায়তা কেন্দ্র, হেল্পলাইন এবং আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ১০৯ নম্বর হেল্পলাইন নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

৫.

প্রতিরোধে বা প্রতিকার পেতে কী করতে হবে?

নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে কী করতে হবে এ বিষয়ে নাগরিক উদ্যোগে-এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, নারী ও শিশুদের উপর পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে প্রায় দুইদশক ধরে কাজ করছে নাগরিক উদ্যোগ। নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও বিরোধ মিমাংসার জন্য আমরা মূলত দুটো কাজ করেছি, ১. নারীর মানবাধিকার সুরক্ষায় ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব তৈরি করেছি যারা নির্যাতিত নারীদের একটা আশ্রয় পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারছে; ২. প্রচলিত সালিশের মাধ্যমে নির্যাতিত মেয়েটিকে ক্ষতিপুরণ আদায় বা সংসারে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। কারণ মেয়েরা নির্যাতিত হলেও স্বামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায়না, তারা চায় সংসারে ফিরতে তারা চায় কেবল তাদের উপর হওয়া অত্যাচারটা বন্ধ হোক। এক্ষেত্রে প্রচলিত সালিশব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজে একটা বড় ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরও বলেন, এছাড়া দলিতদের নিয়েও আমরা কাজ করি ওখানে বাল্যবিবাহ, যৌতুকের প্রবণতা অনেক বেশি। দলিতদের নিজ্স্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে পরিবারে নির্যাতন বা অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে বিচার করা হয়। কিন্তু সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীর কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। এমনকি নির্যাতিত নারীর মতামতও নেয়া হয় না। তবে আমাদের কিছু চেঞ্জ এজেন্ট বা পরিবর্তন সহায়ক কাজ করছে যারা নারীদের মধ্যে অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, নারীর কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন সরকারি ভাতা ও প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা করছে।

৬.

শেষ কথা

নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে শিক্ষা, সচেতনার পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবার, সমাজের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে হবে। নাহলে সতীদাহ প্রথার মতো অনেকটা এই আত্মহত্যা, নির্যাতন চলতেই থাকবে। কথাগুলো বলেছিলেন বিন্দু রানী দাস-দলিত কমিউনিটি, ওয়ারি সিটি কলোনি।

নারীর প্রতি হওয়া এই অমানবিক আচরণ, সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা দরকার। গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে, নারীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়ন যা নারীদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাসন্তি সাহা
কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট- বাংলাদেশ
এশিয়া দলিত রাইটস ফোরাম।
basantitaposh@gmail.com

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কতদূর?

দোলন চন্দ্র রায়

১.

এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৮ জন নারী প্রার্থী হয়েছেন। উদ্বেগজনক বিষয় হলো এই ৭৮ জন নারীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র বহন করেন না। তথ্য-বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশিরভাগই কোনো না কোনো পুরুষ রাজনীতিকের স্ত্রী, কন্যা কিংবা পরিবারের সদস্য। দলীয় নেতৃত্ব ও ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রেই তাদের রাজনৈতিক উত্থান। আবার এই নারী প্রার্থীরা ৩০০ টি সংসদীয় আসনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাত্র ৬৭ টি আসনে। ফলে দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে সরাসরি নির্বাচিত কোন নারী প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সদস্য জেস-মিন টুলী বলেন, "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এখনো গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক"। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী রাজনীতিক বা সংসদ সদস্য পারিবারিক প্রভাবের মাধ্যমেই উঠে এসেছেন। একেবারে তৃণমূল থেকে সংগ্রাম করে উঠে আসা নারীর সংখ্যা খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে মাঠপর্যায়ে কাজ করে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা নারী নেতৃত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

২.

স্বাধীনতা উত্তর সময় থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই ৫৪ বছরের শাসনামলের মধ্যে প্রায় ৩৪ বছরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দুজন নারী, শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া। অথচ বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়া নারীদের সংখ্যা এখনো হাতেগোনা। বলা বাহুল্য, অনেকখানি উত্তরাধিকার সুত্রে বা বংশানুক্রমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের প্রবেশ ঘটছে যা এখনো প্রবাহমান।

বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইমলাম তার বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কাব্য-এর 'নারী' কবিতাটি ১৯২৫ সালে রচনা করেছিলেন। আজ থেকে হিসাব করলে ঠিক ১০০ বছর হলো কবিতার বয়স। যে সময় এই সমাজ ছিল গভীর অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ সেই সময়েও আমাদের প্রিয় কবি বুঝতে পেরেছিলেন নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া এই সমাজ- এই জাতি- সর্বোপরি একটি দেশকে সামগ্রিকভাবে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাস ঘাটলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বীরত্বগাঁথা খুঁজে পাওয়া যায়।

৩.

বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিল, সভা ও প্রচারপত্র বিতরণে অংশ নিয়েছেন । সেইসময় সাংবাদিক সেলিনা পারভীন ভাষা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই আন্দোলন নারীর রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি স্থাপন করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা মুক্তিকামী জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছেন, তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন। শরণার্থী শিবিরে নারীরা ত্রাণ ও চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের ত্যাগ ও সাহসিকতা আজও জাতীয় ইতিহাসে অম্লান। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও শিক্ষার্থী আন্দোলনেও নারীরা সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূণ্ ভূমিকা পালন করেছেন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জুলাই- আগস্টের কর্তৃত্ববাদী শাসন বিরোধী আন্দোলনেও নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সময়ের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার যাতাকলে এই জেন-জি'র নারীরাও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। যে দু-একজন এখনো মাঠে লড়ছে তারা তাদের সর্বোচ্চ মেধা দিয়েই যে মাঠে লড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪.

ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত বিশেষ করে উন্নয়ন অধ্যয়নে 'উইম্যান এম্পাওরমেন্ট' বা বাংলায় 'নারীর ক্ষমতায়ন' শব্দটি বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়। সাধারণত নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদেরকে ক্ষমতায়িত করার প্রক্রিয়াটাকে বোঝানো হয়- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন নারী তাদের জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বিশেষ কিছু জায়গায় কিছুটা উন্নতি দৃশ্যমান হলেও নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও নারীকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করার প্রক্রিয়াটি এখনো তলানিতে পড়ে রয়েছে। অথচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডো (CEDAW) অনুমোদন করে, যা নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি ২০১১ সালে প্রণীত "নারী উন্নয়ন নীতি" নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য স্থির করে। বাংলাদেশের সংবিধান নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করেছে। অনুচ্ছেদ ২৭-এ নাগরিকদের আইনের দৃষ্টিতে সমান ঘোষণা করে, অনুচ্ছেদ ২৮ নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্রকে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। অনুচ্ছেদ ৬৫ সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করে। এর ফলে বর্তমানে সংসদে শতাধিক নারী সদস্য রয়েছেন এবং স্থানীয় সরকারেও সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। মানবাধিকার নীতিমালা অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি মৌলিক অধিকার। নারীর ক্ষমতায়নকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখা হয়। এটি কেবল সমতার প্রশ্ন নয় বরং টেকসই উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসনের অপরিহার্য শর্ত।

৫.

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সকল নির্বাচনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, সকল রাজনৈতিক দল নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে চরম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে নারীদের জন্য সংসদে ১৫ টি আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো। পরবর্তী ১৯৭৯ সালের নির্বাচিত সংসদ সেটি বাড়িয়ে ৩০ টি আসন করে এবং সেইবারই প্রথম নারী হিসেবে সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-১৪ আসন (বর্তমান সাতক্ষীরা সদর ও কলারোয়া উপজেলা) থেকে মুসলিম লীগের হয়ে উপ-নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ৮ টি নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বমোট মনোনীত প্রার্থীর বিপরীতে মনোনীত নারী প্রার্থীর শতকরা হার ৫% এর উপরে কখনোই দেখা যায়নি। আবার এই ৫৪ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে প্রায় ৯০০ -এর বেশি পুরুষ জায়গা পেয়েছেন যেখানে মাত্র নারীর সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা ৫০ বা তারও কম। কারণ কিছু সংখ্যক নারী একাধিক সংসদে/ মন্ত্রীসভায় জায়গা পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় ২০০৮ সালে দেশে প্রথমবারের মতো শামসুল হুদা কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু করে এবং নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব বাড়ানোর বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়। ২০২০ সালের মধ্যে সব দলকে ৩৩ শতাংশ নারীর নেতৃত্ব নিশ্চিত করার শর্তারোপ করা হয়। যদিও এই শর্তের যৌক্তিকতা নিয়ে একাধিক ধর্মভিত্তিক দল প্রশ্ন তুলেছিলো। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই বেধেঁ দেয়া সময়ের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলই এই শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়নি।

৬.

সর্বশেষ ২০১৬ সালে বিএনপির ষষ্ঠ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে দলের স্থায়ী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি মিলে নারীর সংখ্যা হয়েছে ৭৩, যেখানে আগের কমিটিতে ছিলেন ৪৪ জন। সে হিসাবে গতবারের চেয়ে এবার বিএনপিতে নারী নেতৃত্ব বেড়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। ৫০২ সদস্যের নির্বাহী কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সম্পাদক, সম্পাদক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য মিলে মোট নারীর সংখ্যা ৬৭ জন, যা শতকরা হিসাবে ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এছাড়া ১৯ সদস্যের স্থায়ী কমিটির ফোরামে একজন এবং ৭৩ সদস্যের উপদেষ্টা কাউন্সিলে ছয়জন নারী রয়েছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি মিলে নারী প্রতিনিধিত্ব এখন ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে, সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগে নারী নেতৃত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সর্বশেষ কাউন্সিলে (ডিসেম্বর ২০২২) ৭৯ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী রয়েছেন ২০ জন। এ হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ ২৫ দশমিক ৩১ শতাংশ। দলটির ৯১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির দুটি পদ শূন্য রয়েছে। দলটির শীর্ষ নেতা ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া দলটির সভাপতিমন্ডলিতে ৩ জন, সম্পাদকমন্ডলিতে ৭ জন ও কেন্দ্রীয় সদস্য পদে ৯ জন নারী রয়েছে। এর বাইরে আওয়ামী লীগের ৪৫ জন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছে ৫ জন। অবশ্য ২০০৮ সালে দলটি যখন নির্বাচন কমিশনের শর্তপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিবন্ধন নিয়েছিল, তখন দলটিতে নারী নেতৃত্ব ছিল মাত্র ১১ শতাংশ। সেই হিসাবে দেড় দশকে দলটির নারী নেতৃত্ব দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও তৃণমূলে এ চিত্র হতাশাজনক। তৃণমূল সংগঠনগুলোর মধ্যে

কেবল নারী উইং ছাড়া নারী নেতৃত্ব নেই বললেই চলে। দলটির সহযোগী ও ভ্রাতৃ প্রতিম সংগঠনের চিত্রও একই রকম। দলের ৮টি সহযোগী ও দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের মধ্যে যুব মহিলা লীগের বাইরে শীর্ষ দুটি পদের মধ্যে কেবল কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক নারী।

২০২১ সালের জুলাইয়ে ইসিকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণফ্রন্টের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ, জাতীয় পার্টি-জেপিতে ১৬ শতাংশ, সিপিবিতে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ ও জাসদে ১১ দশমিক ৯২ শতাংশ, এনপিপির ২০ শতাংশ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ৬ শতাংশ, গণতন্ত্রী পার্টিতে ১৫ শতাংশ ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টে ১ শতাংশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলিডিপির) কমিটিতে ২২ শতাংশ নারী নেতৃত্ব রয়েছে। ওই সময় বিকল্পধারা ২০২০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ অন্যান্য সব কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি উল্লেখ করে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের এই শর্ত বাতিল করার প্রস্তাব দেয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান আমাদেরকে একটি নতুন সমতাভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মর্যাদাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে স্বপ্ন যে অনেকখানি ফিকে হওয়ার পথে হেঁটেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময় থেকেই নারীরা ট্রল বা সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্যের শিকার হতে শুরু করে। সমাজের নানান স্তর থেকে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের পাশাপাশি তাদেরকে নেতৃত্বের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়াই ছিলো যেন এই গোষ্ঠির গোপন বাসনা। আন্দোলনের দেড় বছর পর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে করে এই অশুভ শক্তি যে সফল হতে পেরেছে তা সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর মনোয়ন প্রার্থীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। একইসাথে গণঅভ্যুত্থানের শক্তি হিসেবে বিবেচিত এনসিপিও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সুকৌশলে কিছুটা এড়িয়ে যাওয়ার পুরুষ-তান্ত্রিক মানসিকতাও লক্ষ করা গেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশনের মধ্যে সবচেয়ে অবেহেলিত কমিশন ছিলো নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন। শুধু তাই নয় বাস্তবায়নের দিক থেকে অন্য কমিশনের প্রতিবেদনগুলোকে যতটা না গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে ঠিক ততটাই অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে নারী কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদন। একধরনের মাচার উপর পুরোনো বই-খাতা তুলে রাখার মতো।

৭.

গত ২৮ জানুয়ারি 'রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব: সংকট ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, "মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত নারীদের গুরুত্ব দেয় না"। তিনি বলেন, যেসব নারীর বাবা, ভাই কিংবা স্বামী রাজনীতিতে আছেন, তাদেরই জয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে দল মনে করে। বাস্তবতা হলো, এবারও তৃণমূল থেকে উঠে আসা কোনো নারী নেত্রী মনোনয়ন পাননি"। উল্লেখ্য, বিএনপির ১০ জন নারী প্রার্থীর সবাই সরাসরি দলের শীর্ষ নেতাদের পরিবারের সদস্য। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে মোট ৫১টি দল। এই দলগুলোর মধ্যে ২০টি দলের নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই নির্বাচনে। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন নারী প্রার্থীরা। তবে যেকোনো দলের নারী প্রার্থীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে অংশ নেওয়া নারী প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি। দলগুলোর নারী প্রার্থী দেয়ার হার যথাক্রমে বিএনপি ৩. ৪৭ শতাংশ, এনসিপি ৬.২৫ শতাংশ, বাসদ ৩.৮৪ শতাংশ, জাতীয় পার্টি (জাপা) ৩.১২ শতাংশ। স্বতন্ত্র নারী প্রার্থী মোট ১৮ জন যা মোট সংখ্যার মাত্র ৭.২২ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য যে দলগুলো থেকে নারী প্রার্থী দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো:- আমার বাংলাদেশ পার্টি'র (এবি পার্টি) একজন; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) চার জন; জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) ছয় জন; ন্যাশনাল পিপলস পার্টি'র একজন; ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ছয় জন; গণসংহতি আন্দোলনের চার জন; বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি'র দুই জন; গণঅধিকার পরিষদের তিন জন; গণফোরামের তিন জন; বাংলাদেশ মুসলিম লীগের একজন; বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির (বিআরপি) একজন; বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির একজন; আমজনতার দলের একজন; বাংলাদেশ লেবার পার্টির একজন এবং ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের একজন। অন্যদিকে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ৫১ টি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ ৩০ টি দলের কোন নারী প্রার্থীই ঘোষণা করা হয়নি। এখন দেখার বিষয় কতজন নারী প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং কতজন প্রার্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় তথা মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন।

দোলন চন্দ্র রায়
মিল স্পেশালিষ্ট
নাগরিক উদ্যোগ
roydolon113@gmail.com

তথ্যসূত্র:
বিভিন্ন বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ।

২০২৫ সালের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি:

সংকট, সম্ভাবনা ও শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতাঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আবু নাছের (মাসুদ)

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ সমাজ ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও বাস্তবে তারাই সবচেয়ে বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিল্প, কৃষি, নির্মাণ ও উৎপাদন খাত সচল রাখলেও ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও মানবিক অধিকার থেকে অনেক শ্রমিক এখনো বঞ্চিত। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কম মজুরি, অনিরাপদ কর্মস্থল, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং সরকার ও মালিকপক্ষের অবহেলা তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। জীবিকার তাগিদে অসুস্থ শরীর নিয়েও কাজে নামতে হয় অনেককে। শ্রমিকদের ঘাম ও শ্রমে দেশের অর্থনীতি এগিয়ে গেলেও তাদের জীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা খুব কমই আসে। তবুও পরিবার ও ভবিষ্যতের আশায় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমজীবী মানুষ।

২০২৫ সালে দেশ এবং প্রবাসে বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের কাজ, শিল্প ও শ্রম পরিস্থিতি, দাবি, নিয়ে দেশের ২৪টি জাতীয় সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে-

ক. বাংলাদেশের শ্রমখাত: সংকট, বৈষম্য ও টিকে থাকার সংগ্রাম

বাংলাদেশের শ্রমবাজার: পরিসংখ্যান, বাস্তবতা ও উদ্বেগ: বাংলাদেশের শিল্প ও শ্রমখাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪৪ লাখ ৪০ হাজার ১৭৯ জন। এর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প বা আরএমজি খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১৮ লাখ ১০ হাজার ৬৮৭ জন। বাকি ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৪৯২ জন শ্রমিক নন-

আরএমজি খাতে কাজ করছেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মোট প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ৪০ দশমিক ৭৮ শতাংশই তৈরি পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এই পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়।

তবে এই পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের মতে, পোশাক খাতে শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি। শ্রমিক নেতাদের দাবি, দেশে বর্তমানে গার্মেন্টস খাতে কমপক্ষে ৩৫ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, একসময় দেশে গার্মেন্টস শ্রমিকের সংখ্যা ৪০-৪২ লাখ বলে উল্লেখ করা হতো। ডিজিটালাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা কোনোভাবেই ৩৫ লাখের নিচে নামেনি। তাঁর মতে, সরকারি প্রতিবেদনে যে ১৮ লাখ শ্রমিকের তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অন্যদিকে দেশে কর্মসংস্থান সংকটও উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। গত ১০ মাসে প্রায় ২১ লাখ মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১৮ লাখই নারী। অর্থাৎ চাকরি হারানো মানুষের বড় অংশই নারী শ্রমিক। শ্রমবাজারে নারীদের এই বিপুলসংখ্যক ছিটকে পড়া দেশের অর্থনীতি ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বড় ধরনের অশনি সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ এর মতে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের জরুরি নীতিগত পদক্ষেপ বিশেষ করে, নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমখাত ও শ্রমিকের অনিরাপত্তা: দেশের মোট শ্রমিকশ্রেণির প্রায় ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এদের অধিকাংশের নেই কোনো চাকরির নিশ্চয়তা, নেই শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা। দেশের ১৪২টি খাত ও উপখাতের মধ্যে মাত্র ৪২টিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাকি প্রায় ১০০টি খাতের শ্রমিকেরা এখনো নির্দিষ্ট মজুরি কাঠামোর বাইরে কাজ করছেন। ফলে কম মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও শোষণ যেন তাদের নিত্যসঙ্গী।

শ্রম বিশেষজ্ঞ ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, দেশের সব শ্রমিককে আইনি সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। শ্রমিকের পরিচয়, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত না হলে শিল্পের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর মতে, ন্যূনতম মজুরির একটি মানদন্ড নির্ধারণ করে তা প্রতি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ করা জরুরি।

নারী শ্রমিক, অগ্রগতির আড়ালে বৈষম্য ও অনিরাপত্তা: বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছেএটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। একসময় নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ ছিল ৩৬ শতাংশের কাছাকাছি, যা এখন ৪২ শতাংশের বেশি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই অগ্রগতির আড়ালে লুকিয়ে আছে নানা বৈষম্য ও অনিরাপত্তা। মাঝারি ও উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ এখনো অত্যন্ত কম। সামাজিক রীতি, পারিবারিক দায়িত্ব, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং নিরাপত্তাহীনতা নারীদের পেশাগত অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিশেষ করে শ্রমজীবী নারীরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার। সরকারি চাকরিজীবীরা ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পেলেও অধিকাংশ নারী শ্রমিক এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সময়ে চাকরিই হারাতে হয়। শ্রম অধিকারকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় ৯০ শতাংশ নারী মাতৃত্বকালীন সময়ে বেতন পান না। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, কম মজুরি এবং অনিরাপদ পরিবেশ তাদের জীবনের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী অধিকার আন্দোলন ও ১১ দফা দাবি: শ্রম আইনে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সম ও মর্যাদাপূর্ণ মজুরি, নারী শ্রমিকের স্বীকৃতি, ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন নিপীড়-নবিরোধী নীতি-অভিযোগ সেল গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আইন প্রণয়ন-সহ ১১ দফা দাবীতে "ক্ষুব্ধ নারীসমাজ" ব্যানারে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ মানব-বন্ধন আয়োজন করা হয়। দাবিগুলো হচ্ছে-

- নারীর উপর যেকোনো ধরনের সংঘবদ্ধ সহিংসতা বন্ধে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাপ্তরিক বা অধিকারভিত্তিক কমিটি, রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নারীর সমান উপস্থিতি ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- জুলাই অভ্যুত্থানের নারী যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নারী, কন্যাশিশু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও লিঙ্গবৈচিত্র্য-ময় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত, লিঙ্গভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক ও সংঘবদ্ধ সহিংসতা বন্ধ এবং মৌলবাদী ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর বিস্তার রোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ধর্ষণ, যৌতুক, যৌননিপীড়ন ও উত্যক্তকরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতাবিরোধী প্রচলিত আইন সমূহ নারীর বৈচিত্র্যময় জীবন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ স্বার্থ ও সম-অধিকার বিবেচনায় সংশোধন ও

পরিমার্জন করতে হবে।

- আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, গৃহকর্মী, তৈরি পোশাক কর্মী এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী ও প্রবাসী নারীদের সর্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী নারীর জন্য গণপরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রবেশগম্য করতে হবে এবং বিশেষ সহায়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি জেলায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, নারী সহায়তা ও তদন্ত বিভাগ, কাউন্সেলিং, সাইবার সাপোর্ট ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীবিদ্বেষী কার্যক্রম ও প্রচার নিষিদ্ধ করতে সাইবার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীর উপর সহিংসতা বিরোধী আইন, নারীর অধিকার ও সহায়তা সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে বয়সভিত্তিক জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক যৌনশিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের গভীর সংকট: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে এ খাত নানা সংকটে জর্জরিত। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর নতুন করে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পাঠানো চিঠিতে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্তে সেই হার ১৫ শতাংশ কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। গত এক বছরে দেশে ১৮৫টি গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন।

গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়া, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যাংক সুদের উচ্চহার শিল্পখাতকে চাপে ফেলেছে। উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতাও এ সংকটকে আরও গভীর করেছে। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মালিকদের অনুপস্থিতির কারণে অনেক কারখানা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। কিছু মালিক বিদেশে পালিয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন- বোনাস ও পাওনা অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকের পাওনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা: শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া মালিকদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড অ্যালার্ট জারির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অতীতে শিল্পখাতে রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্বৃত্তায়নের কারণে শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। অনেক শিল্প মালিক একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ হওয়ায় শ্রমিকের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। যদি কোনো গার্মেন্টস মালিক শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন, তাহলে শ্রমিকদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া দেশের কিছু শিল্প মালিক বিশেষ করে গার্মেন্টস খাতে-অনিয়ম বা দুর্নীতির কারণে শিল্প খাতের সুনাম ক্ষুন্ন করছেন, যার ফলে সৎ ও ভালো উদ্যোক্তারাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ ও নেতিবাচক প্রভাবের মুখে পড়ছেন।

তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি: দেশের তৈরি পোশাক খাতের ৩৮৫টি কারখানার ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন ন্যূনতম মজুরি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে ৬৮ শতাংশ কারখানা। বাকি ৩২ শতাংশ কারখানা বিভিন্ন কারণে সরকারের সর্বশেষ ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এসব কারখানার মধ্যে ২২ শতাংশ আগের তুলনায় মজুরি বাড়িয়েছে। সাসটেইনেবল টেক্সটাইল ইনিশিয়েটিভঃ টুগেদার ফর চেঞ্জ (স্টিচ) এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৮০০ টাকা নির্ধারণ করে এবং ইপিজেডের বাইরের কারখানার জন্য ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

ন্যূনতম মজুরি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না করা কারখানার ৩৩ শতাংশ জানিয়েছে, তাদের পরিচালন ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ২৪ শতাংশ জানিয়েছে, তারা ব্র্যান্ড ক্রেতাদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাননি। অন্যদিকে যারা বাস্তবায়ন করেছে, তাদের ৭৫ শতাংশই খরচ বাড়ার কথা জানিয়েছেন। জরিপে অংশ নেওয়া ৮৩ শতাংশ কারখানা জানিয়েছে, নতুন মজুরি বাস্তবায়নে তারা সরকার কিংবা ক্রেতার সহযোগিতা পাননি। ইপিজেডের ১৮ শতাংশ এবং ইপিজেডের বাইরের ৩৩ শতাংশ কারখানা জানিয়েছে, ক্রেতারা কিছুটা দাম বাড়িয়েছে।

রানা প্লাজা: বাংলাদেশের শ্রম ইতিহাসের কালো অধ্যায়: ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সংঘটিত রানা প্লাজা ধসে ১ হাজার ১৩৫ জন শ্রমিক নিহত হন এবং ১ হাজার ১৬৯ জন গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মোট ২০টি মামলা দায়ের করা হলেও বিচারিক প্রক্রিয়ার ধীরগতির কারণে ১২ বছর পরও অধিকাংশ ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

মামলায় মোট ৫৯৪ জন সাক্ষীর তালিকা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৯৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে ঢাকার জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া ভবন নির্মাণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) একটি মামলা এবং নির্মাণ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আরেকটি মামলা দায়ের করে। অভিযোগপত্রভুক্ত তিন আসামির মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মামলার আসামি সংখ্যা ৩৮ জন এবং তাঁদের মধ্যে কেবল সোহেল রানা কারাগারে রয়েছেন।

দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ট্রাস্ট ফর ইনজুরড ওয়ার্কার্স মেডিকেল কেয়ার (টিআইডব্লিউএমসি) নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। International Labour Organization এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, ক্রেতা ও অন্যান্য বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও নিহতদের পরিবারকে এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল অসম ও সীমিত। সর্বোচ্চ প্রায় ৬১ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন প্রায় দেড় লাখ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া দুর্ঘটনার পর সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া অনুদানের অর্থ ও মূল ক্ষতিপূরণ থেকে সমন্বয় বা কেটে রাখা হয়েছিল, যা নিয়ে ভুক্তভোগীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

International Labour Organization এর কনভেনশন ১২১ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিকের বয়স, দক্ষতা, আয় ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতাকে বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই মানদন্ড অনুসারে পরিচালিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, রানা প্লাজা ধ্বংস এ হতাহত শ্রমিকদের গড় বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। অর্থাৎ তাদের সামনে দীর্ঘ কর্মজীবন অবশিষ্ট ছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনি কাঠামো অনুযায়ী একজন শ্রমিক যদি ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পেতেন, তবে তাঁর সম্ভাব্য আয় ও জীবিকার ক্ষতি বিবেচনায় কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেশের শ্রম আইনে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দীর্ঘদিন ধরে মাত্র দুই লাখ টাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, যা শ্রমিকের জীবন ও ভবিষ্যৎ আয়ের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল বলে সমালোচিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর উচ্চ আদালত ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেন। মহামান্য হাইকোর্ট সুপারিশ করেছিলেন-

স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকদের ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা,

- একটি অঙ্গ হারানো শ্রমিকদের সাড়ে সাত লাখ টাকা,
- দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন এমন শ্রমিকদের সাড়ে চার লাখ টাকা এবং
- মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রমিকদের দেড় লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত।

এই সুপারিশগুলো শুধু শারীরিক ক্ষতির নয় বরং মানসিক ও সামাজিক ক্ষতিকেও স্বীকৃতি দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

তাজরীন ট্র্যাজেডি; ভুলে যাওয়া শ্রমিকের আর্তনাদ: ২০১২ সালের তাজরীন ফ্যাশনস অগ্নিকান্ডে ১১৭ জন শ্রমিক নিহত হন এবং আহত হন শতাধিক শ্রমিক। কিন্তু আহত শ্রমিকদের অনেকে আজও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাননি। অনেকেই পঙ্গুত্ব ও শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

সবুজ শিল্পায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি: সব সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের শিল্পখাতে ইতিবাচক অগ্রগতির একটি বড় উদাহরণ হলো পরিবেশবান্ধব বা "সবুজ" কারখানা। বর্তমানে দেশে ২৬৮টি লিড সার্টিফায়েড সবুজ কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ১১৪টি প্লাটিনাম সার্টিফায়েড। ২০১২ সালে বিশ্বের প্রথম লিড প্লাটিনাম সার্টিফায়েড ডেনিম কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। এটি বাংলাদেশের শিল্পখাতের জন্য একটি গৌরবজনক অর্জন।

নতুন সম্ভাবনা: পুনরায় চালু হচ্ছে বেক্সিমকো টেক্সটাইল: দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বেক্সিমকো টেক্সটাইল ডিভিশন পুনরায় চালুর উদ্যোগ শ্রমবাজারে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। জাপান-বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান রিভাইভাল গ্রুপের উদ্যোগে কারখানাটি চালু হলে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক আবার কাজে ফিরতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

জুলাই সনদ, শ্রমিকের প্রত্যাশা ও শ্রম আইন সংস্কারের দাবি: জুলাই আন্দোলনে নারী, পুরুষ, তরুণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনে ১১২ জন শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ শহীদ হয়েছেন এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়ে অনেকে স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নয়; বরং এটি ছিল মর্যাদাপূর্ণ জীবন, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খার প্রতিফলন।

তবে শ্রম অধিকারকর্মী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, জুলাই-পরবর্তী রাষ্ট্রচিন্তা এবং অন্তবর্তী সরকার ঘোষিত জুলাই সনদে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা ও দাবি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। একইভাবে ঐকমত্য কমিশনের শ্রম ও নারীবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোও যথাযথ গুরুত্ব পায়নি বলে তাদের দাবি। ফলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্ন এখনো উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

অন্তবর্তী সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমখাতকে

আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অঙ্গীকার থাকলেও এখনো শ্রম আইন সংশোধন এবং শ্রম কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, বিচার ও রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি শ্রমিক অধিকারের বাস্তবায়নের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বরং এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত।

তাদের দাবি, নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের আগেই শ্রম কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসারে শ্রম আইন সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

শ্রম অধিকারকর্মীদের মতে, শ্রমিকের অধিকার উপেক্ষা করে টেকসই গণতন্ত্র বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে শ্রমিকদের আকাঙ্খা ও অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

আজও প্রশ্ন রয়ে গেছে- শ্রমিকদের জন্য কেমন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে? দেশের প্রায় ৮ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৮৫ শতাংশ এখনো প্রাতিষ্ঠানিক আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার বাইরে। তাদের অনেকেরই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই, কর্মস্থলে পরিচয়পত্র নেই, নেই স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন বা দুর্ঘটনা সুরক্ষা। তাই জুলাই আন্দোলনের অর্জনকে অর্থবহ করতে হলে শ্রমিকদের অধিকারকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কেন্দ্রে আনা জরুরি প্রয়োজন-

- সকল শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করা;
- কর্মস্থলে পরিচয়পত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা;
- ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;
- আহত ও নিহত শ্রমিক পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- শ্রম আইনকে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংশোধন করা;
- ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ করা।

খ. কৃষি শ্রমিকদের নেই ন্যূনতম মজুরি কাঠামো, আছে নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্যঃ প্রয়োজন নারীবান্ধব কৃষিব্যবস্থা-

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত এখনো অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। এর মধ্যে ২৬ শতাংশ নারী এবং ১৯ শতাংশ পরুষ। সংখ্যার হিসেবে কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে প্রায় ৩ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার মানুষ কাজ করছেন। নারী শ্রমশক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং পরুষদের প্রায় ৩০ শতাংশ এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। শহরের তুলনায় গ্রামে নারী-পুরুষ উভয়ের কৃষি-কাজে অংশগ্রহণ প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

এত বড় কর্মসংস্থানের উৎস হওয়া সত্ত্বেও কৃষি শ্রমিকরা এখনো ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর বাইরে। বর্তমানে দেশের ৪৭টি শিল্পখাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হলেও কৃষি খাতকে সেই আওতায় আনা হয়নি। ফলে কৃষি শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মৌসুম ও বাজারদরের ওপর নির্ভরশীল অনিশ্চিত আয় নিয়ে জীবনযাপন করছেন।

এর পাশাপাশি এই খাতে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। একই কাজের জন্য নারী শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান। নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ, সামাজিক স্বীকৃতির অভাব এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাসব মিলিয়ে নারী কৃষি শ্রমিকরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। নারীর হাতে কৃষির মূলধন পৌঁছে দিতে হবে, ভূমির মালিকানা বাড়াতে হবে, এবং মালিকানা না থাকলেও কৃষিঋণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নারীবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি তাদের কাছে সহজলভ্য করতে হবে।

কৃষি শ্রমিকদের সুরক্ষার অভাবঃ কৃষি শ্রমিকরা প্রতিদিন নানাধরণের ঝুঁকি নিয়ে মাঠে কাজ করেন। বজ্রপাত, সাপের কামড়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া কিংবা কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি-সবকিছুই তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের জন্য কোনো কার্যকর ক্ষতিপূরণ বা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই।

বিশ্বের অনেক দেশে কৃষি খাতকে শ্রম সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা হলেও বাংলাদেশ এখনো সেই দিক থেকে পিছিয়ে। ফলে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

কৃষিজমি হারিয়ে যাওয়াঃ বড় সংকট-কৃষি দেশের জিডিপির প্রায় ১১ শতাংশ জোগান দেয় এবং গ্রামীণ মানুষের প্রধান জীবিকার উৎস। কিন্তু প্রতিবছর প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। ভূমি দখল, রাসায়নিকের অপব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই সংকটকে আরও তীব্র করছে।

উত্তরাঞ্চলের কৃষি খাতে নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যঃ রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের কৃষি সেক্টরে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এখনো তাদের সমমজুরি নিশ্চিত হয়নি। পুরুষের সমান কাজ করেও নারী হওয়ার কারণে তারা অনেক কম মজুরি পাচ্ছেন। উত্তরাঞ্চলে প্রায় ১২ লাখ নারী মৌসুমি শ্রমিক মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। মোট শ্রমিকের প্রায় ৪০ শতাংশ নারী হলেও তাদের বঞ্চনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি খাতে মজুরি পরিস্থিতিঃ দেশের ৪০ শতাংশ কৃষক এখনও জাতীয় কৃষি

মজুরি হার দৈনিক ৬০০ টাকা) থেকে কম মজুরি পান। বাকিদের মধ্যে ৬০ শতাংশ কৃষক এই হারের সমান বা এর চেয়েও বেশি মজুরি পান। সিলেট ও খুলনা বিভাগের কৃষকেরা মজুরির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন, আর ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের কৃষকেরা তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি পান।

কৃষি জরিপ ২০২৫ (বিবিএস) ফলাফল: ৩০ জুন ২০২৫ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষি জরিপ ২০২৫'-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। জরিপ অনুযায়ী, শহরের তুলনায় গ্রামীণ কৃষকেরা কম মজুরি পান। শহরাঞ্চলে যেখানে ৭৬ শতাংশ কৃষক যথাযথ মজুরি পান, গ্রামে এই হার ৫৯ শতাংশ।

বিভাগভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, সিলেটে ৬৩ শতাংশ এবং খুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষক ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে ময়মনসিংহে ৭৫ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে ৭৩ শতাংশ কৃষক ন্যায্য মজুরি পান।

পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছেন কৃষি শ্রমিকরা: ন্যায্য মজুরি ও সম্মানের অভাবে কৃষি শ্রমিকদের একটি বড় অংশ পেশা পরিবর্তন করছেন। কেউ প্রবাসে যাচ্ছেন, কেউ গার্মেন্টস বা নির্মাণ খাতে যুক্ত হচ্ছেন। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণও শ্রমের চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে।

সংগঠনহীনতা ও অধিকার বঞ্চনা: কৃষি শ্রমিকদের কোনো শক্তিশালী সংগঠন বা শ্রমিক ইউনিয়ন নেই। ফলে তাদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্যাগুলো নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, ন্যায্য-মূল্য না পাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনেক প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ছেন।

শ্রমিকদের দাবি ও আন্দোলন: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকরা নিয়মিতকরণসহ নয় দফা দাবিতে আন্দোলন করেছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে- ন্যায্য মজুরি, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক, চাকরির নিরাপত্তা, বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ এবং নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও বাস্তবতা: ২০১৮ সালে জাতিসংঘের 'ইউএনড্রপ' ঘোষণায় বাংলাদেশ কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করলেও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

গ. বর্জ্য কর্মীদের মানবেতর জীবন: কম মজুরি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসচ্ছতা, চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অব্যবস্থাপনায় সংকট গভীরতর:

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত অমানবিক এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করে তা দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রাখতে সহায়তা করলেও, তাদের নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা চরম অপরিচ্ছন্ন। শহরের অলিগলিতে যখন নিস্তব্ধতা নেমে আসে, তখনই শুরু হয় একদল নারী--পুরুষের নীরব যুদ্ধ। টন টন বর্জ্য সংগ্রহ করে শহরকে বাসযোগ্য করে তোলেন তাঁরা। আমরা তাঁদের চিনি 'পরিচ্ছন্নতাকর্মী' বা 'বর্জ্য কর্মী' হিসেবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ, রাস্তা ও ড্রেন পরিষ্কার করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতে প্রায় ৬,৫০০ বর্জ্য কর্মী কাজ করেন, যার মধ্যে ২,৭৩০ জনই নারী। অথচ এই নারীরা প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা শ্রম দিয়ে মাত্র ২৫০-৩০০ টাকা মজুরি পান-যা দেশের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রয়েছে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির বিস্তার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিকাদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ হয়, যেখানে ঘুষ দাবি, অস্থায়ী চুক্তি এবং বেতন বকেয়া রাখার মতো অনিয়ম প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক।

স্বাস্থ্যঝুঁকি এই পেশার আরেক ভয়াবহ দিক। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৮৯ শতাংশ নারী বর্জ্য কর্মী দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। আইসিডিডিআরবি-এর জরিপ অনুযায়ী, ৭৮ শতাংশ নারী পিরিয়ডের সময় পুরোনো কাপড় ব্যবহার করেন, ৬৩ শতাংশ জরায়ু সংক্রমণে ভোগেন এবং ৪১ শতাংশের বেশি গর্ভপাতের অভিজ্ঞতা রয়েছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ২০২৩ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, ৬৭ শতাংশ নারী বর্জ্য কর্মী বিষন্নতায় আক্রান্ত এবং ৫৪ শতাংশ অনিদ্রা ও মাথাব্যথায় ভোগেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো- ঢাকার প্রায় ৯০ শতাংশ বর্জ্য কর্মী কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ছাড়াই কাজ করেন। প্রতিদিন তাঁরা শতাধিক রোগজীবাণু ও ভারী ধাতুর সংস্পর্শে আসেন, যা তাঁদের গড় আয়ু সাধারণ মানুষের তুল-নায় ১০-১৫ বছর কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা আরও মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। রক্ত, সংক্রমণ, অপারেশন-পরবর্তী বর্জ্যসহ নানা বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ডের মুখোমুখি হয়েও তাঁদের জন্য নেই পর্যাপ্ত সুরক্ষা বা চিকিৎসা সহায়তা। দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান দায় এড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক উদাহরণ আমাদের নতুন দিশা দেখাতে পারে। ভারতের চেন্নাই ও থাইল্যান্ডের ব্যাংককে নারী বর্জ্য কর্মীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু রয়েছে-যা বাংলাদেশে এখনো অনুপস্থিত।

এই বাস্তবতায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারী বর্জ্য কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা চালু করা, নিয়মিত স্বাস্থ্য

ক্যাম্প পরিচালনা এবং ন্যূনতম দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৬০০ টাকা নির্ধারণ করা সময়ের দাবি। পাশাপাশি শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করলে তাঁদের কর্মপরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই উন্নত হবে।

ঘ. বাংলাদেশে বেকারত্ব, দক্ষতার ঘাটতি ও শ্রমবাজারের সংকট-

বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত এক দশকে দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে বেকারত্ব ক্রমেই বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট শ্রমশক্তি প্রায় ৭ কোটি ৩৪ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ প্রায় ৪ কোটি ৭৪ লাখ এবং নারী প্রায় ২ কোটি ৫৯ লাখ। প্রতিবছর প্রায় ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।

সরকারি হিসাবে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৩০ হাজার হলেও বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মতে, প্রকৃত বেকারত্ব আরও অনেক বেশি। কারণ শ্রমশক্তির বাইরে থাকা প্রায় ৪ কোটি ৬৯ লাখ মানুষকে বিবিএস বেকার হিসেবে গণ্য করে না। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানদন্ড অনুযায়ী, সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ না পেলে তাকে বেকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও দক্ষতার সংকট: দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের বিপুল সংখ্যক কর্মহীন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা নেই। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত সনদকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতায় পিছিয়ে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে ডিজাইন, প্যাটার্ন মেকিং, প্রযুক্তি, ভাষা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর খাতে দক্ষ জনবলের ঘাটতি প্রকট। অথচ দেশের প্রায় দুই কোটি কর্মহীন মানুষের কোনো কারিগরি জ্ঞান নেই।

তরুণদের কর্মসংস্থান ও মানসিকতা: সরকারি চাকরির নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ এবং বিসিএসনির্ভর মানসিকতা তরুণদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথ থেকে দূরে রাখছে। অন্যদিকে দেশীয় শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি না হওয়ায় স্নাতক বেকারত্ব বাড়ছে।

বিনিয়োগ স্থবিরতা ও বেকারত্বের প্রভাব: দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগ স্থবির থাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব কেবল ব্যক্তি ও পারিবারিক সমস্যাই সৃষ্টি করছে না বরং জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও চাকরির ঝুঁকি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবটিকস, আইওটি, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে প্রায় ৫৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। যদিও একই সময়ে বিশ্বব্যাপী নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে, তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

উচ্চশিক্ষা ও মেধাপাচার: দেশে প্রায় ১৭৬টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সীমিত। ফলে চাহিদাসম্পন্ন দক্ষ স্নাতকদের অনেকে বিদেশমুখী হচ্ছেন, যা দেশের শিল্প খাতে দক্ষ জনবলের সংকট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রম অধিকার ও বিনিয়োগ পরিবেশ: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট স্টেটমেন্ট ২০২৫' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। তৈরি পোশাক খাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির সুযোগ এখনও সীমিত। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শ্রমবাজারের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

ঙ. বাংলাদেশের শ্রমিক বাস্তবতা: অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও অধিকারহীন শ্রমজীবী মানুষ-

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি চালিকাশক্তি হলো কৃষি, তৈরি পোশাক শিল্প এবং রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। এই তিন খাত মূলত শ্রমনির্ভর এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে শ্রমিকদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দুঃখজনক-ভাবে, অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচিত সেই শ্রমিকরাই আজ নানা সংকট, বৈষম্য ও অধিকারবঞ্চনার শিকার।

কম মজুরি ও ন্যূনতম মজুরির সংকট: স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠিত হয়নি। বর্তমানে ১৪২টি খাত ও উপখাতের মধ্যে ৮৪টিতেই কোনো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত নেই। বিশেষ করে দেশের ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করলেও তাদের জন্য নিম্নতম মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা কিংবা শ্রম অধিকার নিশ্চিত হয়নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমি-কদের মধ্যে রয়েছেন- কৃষি শ্রমিক, রিক-শাচালক, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, হকার, ভাঙারি সংগ্রহকারী, গৃহকর্মীসহ নানা পেশার মানুষ। তাদের আয় দিয়ে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে পরিবার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

আয় বৈষম্যের ভয়াবহতা: দেশে আয় বৈষম্য এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী- দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে মোট আয়ের ৪৪ শতাংশ, শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষের আয় ১৬.৩ শতাংশ, শীর্ষ ৫ শতাংশ মানুষের

আয় প্রায় ৩০ শতাংশ, অন্যদিকে পিছিয়ে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে মাত্র ১৭.১ শতাংশ আয়। অর্থাৎ দেশের মোট আয়ের বড় অংশ সীমিতসংখ্যক ধনী মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, যা সামাজিক বৈষম্য ও অসন্তোষ বাড়াচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি: বাংলাদেশের শ্রমিকরা প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করছেন। বিশেষ করে গার্মেন্টস, নির্মাণ ও পরিবহন খাতে দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা অত্যন্ত প্রকট। একঘেয়ে ও অতিরিক্ত শ্রমের কারণে অনেক শ্রমিক শারীরিকভাবে ভেঙে পড়ছেন। পাশাপাশি মানসিক চাপ, চাকরি হারানোর ভয়, নির্যাতন ও দুর্ঘটনার ট্রমা থেকে তারা উদ্বেগ, বিষন্নতা ও পিটিএসডির (পোস্ট- -ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার) মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

নারী শ্রমিকদের বিশেষ ঝুঁকি: নারী শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হন। যৌন হয়রানি, মজুরি বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধার অভাব তাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। অভিযোগ করলে অনেক সময় তারা চাকরি হারানো বা আরও হয়রানির শিকার হন। ফলে অধিকাংশ নারী শ্রমিক নীরব থাকতে বাধ্য হন।

শ্রম অধিকার ও বৈশ্বিক দায়বদ্ধতা: বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকারের প্রশ্ন কেবল জাতীয় সমস্যা নয়; এটি বৈশ্বিক অর্থনীতি, বহুজাতিক করপোরেট স্বার্থ এবং শ্রম শোষণের সঙ্গেও জড়িত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), মানবাধিকার সংগঠন, ভোক্তা সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

চ. শিশুশ্রম: জাতীয় অগ্রগতির বড় প্রতিবন্ধকতা-

শিশুশ্রম শুধু একটি শিশুর শৈশব ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে না, বরং একটি দেশের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়নকেও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। নানা উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিশুশ্রম পুরোপুরি কমেনি; বরং কিছু ক্ষেত্রে এর বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে- দারিদ্র্য, শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, সামাজিক সচেতনতার অভাব এবং আইন প্রয়োগের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা হয়। অনেক পরিবার অতিরিক্ত আয়ের জন্য শিশুদের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। আবার জন্মনিবন্ধনের অভাবে অনেক শিশুর বয়স নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে তারা সহজেই শ্রমবাজারে প্রবেশ করে।

আইন ও বাস্তবতার ফাঁক: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ দেওয়া নিষিদ্ধ এবং ১৮ বছরের নিচে বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ দেওয়া আইনত দন্ডনীয়। কিন্তু বাস্তবে এই আইন সব খাতে প্রযোজ্য নয়। কৃষি, গৃহকর্ম এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকাংশেই এই আইনের বাইরে থেকে যাচ্ছে। শ্রম পরিদর্শন অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৩,৪৫৯টি শিশুশ্রম লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্ত করা হয় এবং ৩,৯৯০ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে এই সংখ্যা সমস্যার প্রকৃত চিত্রের তুলনায় খুবই সীমিত।

পরিসংখ্যান যা উদ্বেগজনক: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১.৭৭ মিলিয়ন শিশু শ্রমে নিয়োজিত, যার মধ্যে প্রায় ১.৬৮ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত। অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্থার তথ্য মতে, প্রায় ৩৫ লাখ কর্মজীবী শিশুর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ শিশু বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত। ২০১৩ সালে শিশুশ্রমের হার ছিল ৪.৩০ শতাংশ, যা ২০২২ সালে বেড়ে ৪.৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। দেশে ৪৫ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে ৪১টিতেই শিশুদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০০ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শিশুরা কাজ করছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ভয়াবহ বাস্তবতা: শিশুশ্রমের সবচেয়ে নির্মম চিত্র দেখা যায় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও নির্যাতনের ঘটনায়। ওয়ার্কশপ, গ্যারেজ, ঢালাই কারখানা কিংবা পরিবহন খাতে কাজ করতে গিয়ে অনেক শিশু মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর নির্যাতন (পায়ুপথে গ্যাস ঢুকিয়ে হত্যা) এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটে, যা সমাজের জন্য গভীর লজ্জার।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১,৪০৩টি মামলা করা হলেও এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৫৫১টি। উল্লিখিত মামলাগুলোর মধ্যে ৩৬টি ছিল শিশুশ্রম নিয়ে, অথচ এর মধ্যে মাত্র ৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যা বিচার প্রক্রিয়ার ধীরগতি এবং এ বিষয়ে কার্যকর

পদক্ষেপের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ ও অগ্রগতি: ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের সরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও কনভেনশনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে International Labour Organization-এর কনভেনশন ১৩৮ (ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ) অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) এবং আইএলও কনভেনশন ১৮২ (নিকৃষ্টতম শিশুশ্রম নিরসন) সহ মোট ৩৩টি আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে।

সরকার ও মালিকপক্ষের যৌথ উদ্যোগের ফলে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক (formal) খাত থেকে শিশুশ্রম অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যা একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন, আইনগত কাঠামো জোরদার এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া কিছু উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত শিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। একটি কর্মশালার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত ৫৩ শতাংশ শিশুকে কাজ থেকে সরিয়ে শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক যুবক ও তাদের পরিবারও বিকল্প কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছেন। তবে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক (informal) খাতে। বিশেষ করে কৃষি, গৃহকর্ম, ক্ষুদ্র শিল্প ও পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শিশুশ্রমের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এসব খাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নজরদারির বাইরে থাকায় আইন প্রয়োগও দুর্বল থাকে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সময়োপযোগী আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। তবে টেকসই সাফল্য অর্জনের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কার্যকর নজরদারি, সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

করণীয়:

শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হলে-

- বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার কঠোর-ভাবে বাস্তবায়ন করা;
- আইন প্রয়োগের ফাঁকফোকর বন্ধ করা;
- সব খাতকে শ্রম আইনের আওতায় আনা;
- দরিদ্র পরিবারের জন্য সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা;
- শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক ও মান-সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- ও জন্মনিবন্ধন শতভাগ নিশ্চিত করা।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের শৈশব কেড়ে নিয়ে কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে না। তাই এখনই সময় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার- শিশুশ্রম বন্ধ হোক, শিশুরা ফিরে পাক তাদের হারানো শৈশব, গড়ে উঠুক একটি মানবিক ও উন্নত বাংলাদেশ।

ছ. নির্মাণ শ্রমিকদের অনিরাপদ কর্মক্ষেত্র, কম মজুরি ও আইনের দুর্বল প্রয়োগে বাড়ছে মৃত্যুঝুঁকি-

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাত হলো নির্মাণ খাত। গত এক দশকে এ খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্প এবং সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে নির্মাণ শ্রমিকের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৮ শতাংশ অবদান আসে এই খাত থেকে। বর্তমানে এই খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লাখেরও বেশি। তবে এই অগ্রগতির বিপরীতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও জীবনমানের উন্নয়ন তেমনভাবে ঘটেনি, যা খাতটির টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নির্মাণ খাতে কাজ করছেন, যা বৈদেশিক শ্রমবাজারেও এ খাতের গুরুত্বকে তুলে ধরে। তবে নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এখনো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বেসরকারি সংস্থা সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে ০১ (এক) হাজারের বেশি নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই উচ্চ মৃত্যুহারের পেছনে রয়েছে নিরাপত্তা বিধি না মানা, পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব এবং কার্যকর তদারকির ঘাটতি।

বাংলাদেশে শ্রমিকদের সুরক্ষায় শ্রম আইন, ২০০৬ এবং ইমারত নির্মাণ বিধি-মালা, ২০২০-এর মতো শক্তিশালী আইনি কাঠামো থাকলেও সেগুলোর কার্যকর প্রয়োগ এখনো নিশ্চিত হয়নি। শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এসব আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। এ বাস্তবতায় নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নির্মাণ শ্রমিকদের ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন, ন্যায্য মজুরি প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি।

জ. গৃহকর্মী খাত: অদৃশ্য শ্রমশক্তির বাস্তবতা

বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক মানুষ গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশ নারী। কিন্তু তারা এখনো শ্রমিক হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি ও সুরক্ষার বাইরে। তাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু, যাদের জীবন ও কর্মপরিবেশ মানবাধিকারের ন্যূনতম মানদন্ডের সঙ্গেও অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আইনি স্বীকৃতির অভাব: অনানুষ্ঠানিক খাতের এই বিশাল জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও 'শ্রমিক' হিসেবে তারা এখনো শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত।

নীতিমালা আছে, বাস্তবায়ন নেই: 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' প্রণয়ন করা হলেও এর কার্যকর বাস্তবায়ন হয়নি। নীতিমালায় ছুটি, পারিশ্রমিক, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা ও শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবে তা নিশ্চিত হয়নি।

সংগঠন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: 'জাতীয় নারী গৃহকর্মী ইউনিয়ন' ও 'গৃহকর্মী অধিকার নেটওয়ার্ক' গৃহকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ২০১১ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৮৯ নম্বর সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করলেও এখনো তা অনুমোদন করেনি।

মানবিক সমাজ গঠনের প্রতিবন্ধকতা: গৃহশ্রমিকদের অধিকাংশ অধিকার এখনো কাগজেই সীমাবদ্ধ। সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে নিম্নমানের আবাসন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপ্রতুল খাদ্য ও মানহীন শিক্ষার মধ্যে রেখে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

ঝ. হারানো পাট শিল্পনগরী খালিশপুর: শ্রমিক জীবনে অনিশ্চয়তার দীর্ঘ ছায়া-

ব্রিটিশদের কাছ থেকে ১৯৫৪ সালে পুরাতন মেশিনপত্রের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জুটমিল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই এই অঞ্চলে পাটশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে এসব জুটমিলকে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনে নেওয়া হয়। সে সময় বিজেএমসি অন্তত ৭৮টি মিলের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পাটশিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই মিলগুলোর মাধ্যমেই বাংলাদেশে পাটশিল্পের সোনালি যুগের সূচনা হয়। দিন-রাত নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন চলত, শ্রমিকদের মুখে ছিল স্বস্তি ও আনন্দের ছাপ। পাটকলগুলো শুরুর দিকে ছিল অত্যন্ত লাভজনক এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাটশিল্পের প্রতি তৎকালীন সরকারগুলোর অবহেলা ও অদূরদর্শিতা বাড়তে থাকে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, আধুনিকায়নের ঘাটতি এবং নীতিগত দুর্বলতার কারণে ধীরে ধীরে এই সম্ভাবনাময় শিল্প খাত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

এরপর ২০২০ সালের ২ জুলাই খুলনা--যশোর অঞ্চলের ৯টিসহ সারা দেশের ২৬টি রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। লোকসান, উচ্চ উৎপাদন খরচ ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাকে কারণ হিসেবে দেখানো হলেও, এর ফলে হাজার হাজার শ্রমিক হঠাৎ করেই কর্মহীন হয়ে পড়েন।

কর্মহীন শ্রমিকদের জীবনের বাস্তবতা: পাটকল বন্ধের পর জীবিকার তাগিদে শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশায়। কেউ রিকশা চালাচ্ছেন, কেউ হেলপার, আবার কেউ গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তাদের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও টিকে থাকার কঠিন সংগ্রাম।

সীমিত পরিসরে মিল চালু, অপ্রতুল কর্মসংস্থান: বন্ধ হয়য়ে যাওয়া৷ ৯টি পাটকলের মধ্যে ৪টি-দৌলতপুর জুট মিল, জেজেআই জুট মিল, স্টার জুট মিল এবং কার্পেটিং জুট মিল-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু হয়েছে। তবে এসব মিল চলছে মোট সক্ষমতার মাত্র এক-চতুর্থাংশে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে মাত্র প্রায় দুই হাজার শ্রমিকের জন্য, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

শিল্প কারখানা বন্ধে খুলনার অর্থনীতির পতন: পাটকলের পাশাপাশি খুলনার আরও বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিল, দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে ধীরে ধীরে খুলনার অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ছে এবং শিল্পনগরীর পরিচিতি হারিয়ে যাচ্ছে।

আশায় বুক বাঁধা শ্রমিক সমাজ: সব প্রতিকূলতার মাঝেও শ্রমিকদের চোখে এখনও আশার আলো রয়েছে। তারা চান সরকার দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে মিলগুলো পুনরায় চালু করুক। তাদের প্রত্যাশা খালিশপুর আবারও ফিরে পাক তার হারানো কর্মচাঞ্চল্য, নতুন প্রজন্ম দেখুক এক সম্ভাবনাময় শিল্পভিত্তিক ভবিষ্যৎ।

ঞ. শ্রম আদালতে প্রায় ২২ হাজার মামলা বিচারাধীন: ন্যায়বিচার পেতে শ্রমিকদের দীর্ঘ অপেক্ষা-

আইন থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন: আইন অনুযায়ী শ্রম আদালতে মামলা ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘসূত্রিতা ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে মামলাজট ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে ১৩টি শ্রম আদালতে ৬ মাসের বেশি সময় ধরে ঝুলে আছে ১৩ হাজার ৪০২টি মামলা।

মামলা বাড়ছে, নিষ্পত্তি কম: শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্চ ২০২৫ মাসে শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনালে মোট বিচারাধীন মামলা ছিল ২২ হাজার ৭৩৭টি। ওই মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৭৮৮টি মামলা। এর আগের বছর (২০২৪ সালের মার্চ) বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৬১টি-যা থেকে স্পষ্ট, নিষ্পত্তির তুলনায় মামলা দ্রুত বাড়ছে।

ঢাকার শ্রম আদালতে সর্বোচ্চ চাপ: ঢাকার

তিনটি শ্রম আদালতেই সবচেয়ে বেশি মামলার চাপ দেখা যায়। মোট ১০ হাজার ৫৮৯টি মামলা এখানে বিচারাধীন।

১ম শ্রম আদালত: ৪,৬৭৬টি মামলা (নিষ্পত্তি ৭১টি), ২য় শ্রম আদালত: ৩,২৯৯টি মামলা (নিষ্পত্তি ১২৫টি), ৩য় শ্রম আদালতঃ ২,৬১৪টি মামলা (নিষ্পত্তি ৭৩টি)। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, মামলা নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত কম।

চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের চিত্র: চট্টগ্রামের দুই শ্রম আদালতে মোট ১,৯৩০টি মামলা বিচারাধীন, যেখানে মার্চ ২০২৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১৭টি। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জে ২,১৩৩টি এবং গাজীপুরে ৫,৫২৮টি মামলা বিচারাধীন। এই দুই আদালতে মার্চ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪২৩টি মামলা, যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি হলেও মোট জটের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

অন্যান্য বিভাগীয় আদালতের অবস্থা: খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও বরিশালের শ্রম আদালতগুলোতে মোট ৫০৫টি মামলা বিচারাধীন। সংখ্যাটি তুলনামূলক কম হলেও নিষ্পত্তির ধীরগতি এখানেও একটি সমস্যা।

আপিল ট্রাইব্যুনালে জটের চাপ: শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ঢাকায় একমাত্র শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। বর্তমানে এখানে ১,২২৩টি মামলা বিচারাধীন, যার মধ্যে ৮২২টি মামলা ৬ মাসের বেশি সময় ধরে ঝুলে আছে। একটিমাত্র ট্রাইব্যুনাল থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পক্ষগুলোকে ঢাকায় এসে আপিল করতে হচ্ছে, যা সময় ও ব্যয়ের চাপ বাড়াচ্ছে।

জনবল সংকট ও প্রশাসনিক দুর্বলতা: বর্তমানে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ১৩টি শ্রম আদালতে মোট ৫৮টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি আদালতে রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি। ফলে মামলা দায়েরের, কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি, আদেশের অনুলিপি সংগ্রহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ভোগান্তি বেড়েছে।

মামলাজট নিরসনে দ্রুত বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগ, আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতির প্রসার জরুরি।

ট. শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পেশ-

শ্রম অধিকার শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ১০ সদস্যবিশিষ্ট শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বিল্স (BILS)।

২১ এপ্রিল ২০২৫ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের পক্ষ থেকে সমন্বিত ২৫টি মূল সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। দেশের শতাধিক অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে এই সুপারিশগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের নাগরিক অধিকার, জীবন-জীবিকার মর্যাদা, সম-অধিকার, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং বৈষম্যহীন সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের ২৫টি মূল সুপারিশ-

১. সকল শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা;

২. মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় ও খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিত করা;

৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;

৪. শ্রমশক্তির নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভান্ডার গঠন;

৫. সংগঠন ও দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা;

৬. জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা;

৭. স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন;

৮. কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

৯. সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

১০. সমঅধিকার নিশ্চিত ও সহিংসতা--বৈষম্য দূরীকরণ;

১১. যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি প্রতিরোধ;

১২. সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

১৩. শিশু ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ করা;

১৪. সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা;

১৫. সুষ্ঠু শ্রম আদালত ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা;

১৬. মর্যাদাপূর্ণ ও হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ এবং আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন;

১৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

১৮. আপদকালীন তহবিল গঠন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;

১৯. শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ;

২০. শহিদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;

২১. টেকসই শিল্পায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন;

২২. শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা;

২৩. জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় কর্মপরিবেশ গঠন;

২৪. অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা;

২৫. শ্রমবিষয়ক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা।

ঠ. শ্রম আইন: অগ্রগতি সত্ত্বেও সুরক্ষার বাইরে অধিকাংশ শ্রমিক-

বাংলাদেশে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। তবে আইন প্রণয়নের পর থেকেই এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষই এই আইনের সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির মুখে সরকার আইন সংশোধনে উদ্যোগ নেয়। বিশেষ করে রানা প্লাজা ধস-এরপর ২০১৩ সালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার সংক্রান্ত আরও কিছু সংশোধনী যুক্ত করা হয়। তবে এসব সংশোধনের পরও বাস্তবতা খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। এখনও ধারণা করা হয়, প্রায় ৬৭ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ শ্রম আইনের কার্যকর সুরক্ষার বাইরে। কারণ আইনে প্রদত্ত অধিকাংশ সুবিধা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য, যেখানে দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিকই কাজ করেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সার্ভিস বেনিফিট, ভবিষ্যৎ তহবিল কিংবা কোম্পানির মুনাফায় অংশগ্রহণ-এসব অধিকার তাদের ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রযোজ্য থেকে যায়।

নিয়োগ কাঠামো ও আইনি বঞ্চনা: আইনগত সুবিধা এড়াতে অনেক ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেয়। উচ্চ বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে নারী, শিশু ও অস্থায়ী শ্রমশক্তিকে নিয়োগ দিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। শ্রমিকদের আইনি প্রতিকার নিশ্চিত করতে শ্রম আদালত থাকলেও হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রীতার ভয়ে অধিকাংশ শ্রমিক আদালতের শরণাপন্ন হন না। করপোরেট খাতের শ্রমিকদের মধ্যে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রবণতা কিছুটা থাকলেও শিল্পখাতে তা খুবই সীমিত। এমনকি এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় গেলে অনেক শ্রমিক মিথ্যা মামলা ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হন।

আন্তর্জাতিক মান ও বাংলাদেশের অগ্রগতি: আন্তর্জাতিক শ্রম মান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রম আইনের সংশোধনীতে যুক্তরাষ্ট্রের ১১ দফা সুপারিশ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর পথনকশা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাকশন প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ ও ১৮২ অনুস্বাক্ষর করেছে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধে কনভেনশন ১৯০-ও অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে আইএলও'র ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে।

তদারকির ঘাটতি ও নিরাপত্তা ঝুঁকি: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৪৮ হাজার নিবন্ধিত কারখানার জন্য পরিদর্শক রয়েছেন মাত্র কয়েকশ। ফলে পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)-এর এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৭১ শতাংশ শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ পান না।

ড. বাংলাদেশে নার্সিং পেশার সংকট, বৈষম্য ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর এর প্রভাব-

দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নার্সিং পেশার চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু এ খাতে নীতি-নির্ধারকদের নজর কম থাকায় চাহিদা অনুযায়ী পেশাটির প্রসার ঘটানো যাচ্ছে না। উচ্চশিক্ষার ঘাটতি, গুণগত শিক্ষাদানে যোগ্য শিক্ষক সংকট, প্রাতিষ্ঠানিক অর্গানোগ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ, নিয়মিত নিয়োগ ও পদোন্নতি না থাকায় নার্সদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে রোগীদের সেবাদানে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতায় নার্সিং পেশা পিছিয়ে পড়ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২৯ কোটি নার্স এবং ২ দশমিক ২ কোটি মিডওয়াইফ স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ নার্স ও ৩১ লাখ মিডওয়াইফের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৫০০ নার্স ও মিডওয়াইফারি প্রয়োজন। বর্তমানে ১ লাখ ৩ হাজার ১৫১ নার্স রয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় মাত্র ৩৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশে সরাসরি রোগীর সেবাদানকারী প্রায় ৯২ শতাংশ নার্স কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন।

অধিক কাজের চাপ কিন্তু কম বেতনে কাজ করছেন প্রায় ৯৬ শতাংশ নার্স। ফলে রোগীরাও সঠিক সেবা থেকে বঞ্চিত হন। একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি তিনজন নিবন্ধিত নার্স প্রয়োজন। বাংলাদেশে ১ লাখ ৩৪ হাজার চিকিৎসকের বিপরীতে নার্স প্রয়োজন ৪ লাখ ২ হাজার। অথচ বর্তমানে ১ লাখ ১০ হাজার নিবন্ধিত নার্স রয়েছেন। এই হিসাবে দেশে নার্স সংকট প্রায় ২ লাখ ৯২ হাজার। নার্স সংকটে রোগীরা পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে নার্সদের বেতন কাঠামো নিুমানের। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এ দেশের নার্সদের বেতন প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ কম। তাই এদেশের নার্সরা মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নার্সদের প্রতি সরকারের অবহেলা এজন্য দায়ী।

নার্সদের চাকরিবিধিতে পদোন্নতির জন্য গ্রেড ও পদ নির্ধারণ করা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। একজন নার্স যে পদে চাকরিতে ঢুকছেন, সেই পদেই অবসরে যাচ্ছেন। নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট চলছে সিনিয়র স্টাফ নার্স দিয়ে। ৯০ শতাংশ নার্সের আবাসন ব্যবস্থা নেই। এমনকি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে মহাপরিচালক ও পরিচালকসহ পদের ৯১ শতাংশ পদেই নিয়োগ পাচ্ছেন প্রশাসন ক্যাডারসহ নার্সিং পেশার বাইরের লোকজন। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নার্সদের সাত ধরনের পদ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি পদে পদোন্নতির সুযোগ আছে-নবম গ্রেডে ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট ও নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, সাত বিভাগে সাতজন বিভাগীয় সহকারী পরিচালক এবং জেলায় একজন করে জেলা পাবলিক হেলথ নার্স।

নার্স সংকটে রোগীরা পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না। অনেক রোগী উন্নত সেবার জন্য বিদেশমুখী হচ্ছেন। অতিরিক্ত কাজের চাপ, অপ্রতুল বেতন এবং সামাজিক মর্যাদার অভাবে নার্সরা মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বৈরিতা, উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব এবং রোগীর স্বজনদের দুর্ব্যবহারও তাদের মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। এ জন্য সরকারি অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করা হচ্ছে।

ঢ. পুলিশের কর্মঘণ্টা, ছুটি সংকট ও মানসিক চাপঃ বাস্তবতা ও করণীয়-

অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও ছুটি সংকটঃ বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের প্রতিদিন দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করতে হয়। পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট শুরু থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট শেষ থাকে না। নিয়ম অনুযায়ী আট ঘণ্টা ডিউটির কথা থাকলেও বাস্তবে তাদের প্রায়ই ১০, ১২ এমনকি টানা ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষ করে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হলে, রাজনৈতিক কর্মসূচি, জরুরি অভিযান বা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সময় ডিউটির চাপ আরও বেড়ে যায়। তখন নির্ধারিত কর্মঘণ্টার কোনো বাস্তব প্রয়োগ থাকে না। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিও তৈরি হয় যে, সারারাত দায়িত্ব পালন করার পরও পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না পেয়ে শারীরিক ক্লান্তি, মানসিক চাপ এবং পারিবারিক দূরত্ব-সবকিছু মিলিয়ে পুলিশ সদস্যদের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠিন ও চাপপূর্ণ। অন্য সরকারি চাকরিজীবীরা যেখানে সাপ্তাহিক দুইদিন ছুটি, ঈদসহ অন্যান্য সরকারি ছুটি ভোগ করেন, সেখানে পুলিশ সদস্যরা অধিকাংশ সময় এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতি কামরুল হাসান তালুকদার বলেন, "মানুষ চাকরি করে পরিবারকে আর্থিক ও মানসিকভাবে স্বস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা কি সেটা পারি? পুরো বছরে মাত্র কয়েকদিন ছুটি পাই। মাঝে-মধ্যে যদি কোনো স্বজনের মৃত্যু সংবাদ আসে, তখন আবেদন করলে দু-একদিনের জন্য ছুটি পাই। সেটাও বার্ষিক ছুটি থেকে কেটে নেওয়া হয়। আবার দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হলে বা বড় কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলে তখন সব ধরনের ছুটি বন্ধ। মোটকথা আমাদের যখন ছুটি দরকার হয়, তখন ছুটি মেলে না।"

অতিরিক্ত ডিউটির পারিশ্রমিকের দাবিঃ বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুজ্জামান বলেন, পুলিশ সদস্যদের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত দায়িত্বের বিষয়টি পুলিশ সংস্কার কমিশনের সভাতেও আলোচিত হয়েছে। "পুলিশ সদস্যরা ৮ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করেন, এ বিষয়টি যেন বর্তমান সরকার আমলে নেয়। অতিরিক্ত ডিউটির জন্য পারিশ্রমিক দেওয়ার দাবী জানান"

পুলিশ আইন ও ইমার্জেন্সি সার্ভিসের বাস্তবতাঃ ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে পুলিশকে "ইমার্জেন্সি সার্ভিস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই আইনে সাপ্তাহিক ছুটির কোনো সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়নি। আইনে উল্লেখ রয়েছে- "পুলিশ সদস্যরা সর্বদা দায়িত্বরত (অন ডিউটি) হিসেবে বিবেচিত হবেন।" পুলিশ প্রশাসনের মতে, কনস্টেবল থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনো সময় দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকতে হয়। তবে সংশ্লিষ্টদের মত হলো- পর্যাপ্ত জনবল, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে এই চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। যেন কোনো পুলিশ সদস্যকে নিয়মিত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করতে না হয়।

মানসিক চাপ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিঃ রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের পরিচালক (ডিআইজি) সরদার নূরুল আমিন বলেন,দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব ও মানসিক চাপ পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে গুরুতর প্রভাব ফেলছে। "মেন্টাল স্ট্রেসে (মানসিক চাপ) শ্বাসকষ্ট, আইএলডি (ফুসফুসের রোগ), ডায়াবেটিস বেড়ে যায়, কিডনিজনিত সমস্যাসহ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা।" এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক এবং পেশাগত দক্ষতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অর্জিত ছুটি ও পিআরএল জটিলতাঃ সরকারি

চাকরিবিধি অনুযায়ী পুলিশের সদস্যদেরও বছরে ৩৩ দিন করে অর্জিত ছুটি জমা হয়। তবে বাস্তবে অধিকাংশ পুলিশ সদস্য সেই ছুটি ভোগ করতে পারেন না। ফলে অবসরের সময় দেখা যায়, অনেকেরই এক বছরের বেশি অর্জিত ছুটি জমা থাকে। কিন্তু পিআরএল (Post Retirement Leave) সুবিধার ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ এক বছরের ছুটিই ভোগ করতে পারেন। এতে অতিরিক্ত জমাকৃত ছুটির পূর্ণ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হন।

সর্বোপরি পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জরুরি সেবা খাত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সংকট মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তবে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, ছুটির সংকট এবং মানসিক চাপ পুলিশ সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলছে। তাই জনস্বার্থে কার্যকর পুলিশি সেবা নিশ্চিত করতে হলে তাদের মানবিক কর্মপরিবেশ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ণ. চাতাল শ্রমিকদের জীবনচিত্র

দেশের বৃহৎ চাল উৎপাদন কেন্দ্র আশুগঞ্জ: দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ চাল উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আশুগঞ্জের পরিচিতি রয়েছে। এক সময় এখানে চার শতাধিক চাতাল ছিল। এসব চাতালে কাজ করতেন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার শ্রমিক। কিন্তু ২০১৪-১৫ সালের পর অটো ড্রায়ার কারখানা বাড়তে শুরু করলে ঐতিহ্যবাহী চাতালের সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় দেড়শতে নেমে এসেছে। এর ফলে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন এবং যারা টিকে আছেন, তারাও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

দাদনের জালে বন্দি শ্রমিকজীবন: চাতাল শ্রমিকদের অধিকাংশই অভাবের তাড়নায় মালিক বা মহাজনের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা বা 'দাদন' নেন। এই ঋণের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে তা থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কম মজুরি ও অনিয়মিত কাজের কারণে বছরের পর বছর কাজ করেও তারা ঋণ শোধ করতে পারেন না। অসুস্থতা বা বেকার সময়ে আবারও ধার নিতে হয়। ফলে ঋণের বোঝা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

মৌখিক চুক্তি ও সর্দারনির্ভর ব্যবস্থা: চাতাল শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণত কোনো লিখিত চুক্তি হয় না। মালিকরা সর্দারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করেন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র সর্দারের কাছে জমা থাকে। কোনো শ্রমিক পালিয়ে গেলে দায়ভারও সর্দারের ওপর পড়ে। শ্রমিক এক চাতাল থেকে অন্য চাতালে গেলে নতুন মালিক আগের দাদনের টাকা পরিশোধ করে তাকে নিয়ে যান। এতে শ্রমিকরা কার্যত এক ধরনের বন্দি জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

অমানবিক শ্রমপরিবেশ: চাতাল শ্রমিকদের কাজ অত্যন্ত কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। ধান নামানো, সেদ্ধ করা, শুকানো, বস্তাবন্দি করা-সবকিছুতেই প্রয়োজন হয় কঠোর কায়িক শ্রম। তপ্ত রোদে খালি পায়ে ধান শুকানোর কাজ তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন এ কাজ করার ফলে অনেকেই নানা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন।

সামান্য মজুরি ও সামাজিক বঞ্চনা: দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও চাতাল শ্রমিকদের মজুরি খুবই কম। কাজ বন্ধ থাকলে কোনো আয়ও থাকে না। নির্দিষ্ট শ্রম আইন, স্বাস্থ্যসেবা বা সরকারি সুযোগ--সুবিধা তাদের জন্য নেই। 'কাজ করলে মজুরি, না করলে উপোস- এই বাস্তবতাই তাদের জীবনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও ভবিষ্যৎ সংকট: চাতালের একপাশে টিন বা বাঁশের তৈরি ছোট ছোট স্যাঁতসেঁতে ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন শ্রমিকরা। তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে অনেক শিশুই বড় হয়ে একই পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এভাবে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে।

প্রযুক্তির প্রভাব ও শ্রমিক সংকট: অটো ড্রায়ার কারখানার বিস্তারের ফলে শ্রমিকনির্ভর চাতাল শিল্প ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি উৎপাদন বাড়ালেও হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান কমিয়ে দিয়েছে। এতে শ্রমিকদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

চাতাল শ্রমিকদের জীবন বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক শ্রমখাতের এক কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরে। অমানবিক পরিশ্রম, ঋণের বোঝা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও ভবিষ্যৎহীনতার মধ্যেও তারা দেশের চাল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। চাতাল শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজন লিখিত শ্রমচুক্তি নিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, দাদন প্রথার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, শ্রমিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, এবং শ্রমিকবান্ধব সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন।

ত. লবণ মাঠে শ্রম, জীবনে দুর্ভোগ-

বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার কৃষক পরিবার ও ৫৫ হাজার দক্ষ শ্রমিক সরাসরি লবণ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া আরও পাঁচ লাখের বেশি মানুষ এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। অথচ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

একজন লবণ শ্রমিক প্রতিদিন গড়ে ৪০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন । এই সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয় তাদেরকে। ফলে শহরে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অসুস্থ হলে স্থানীয় ফার্মেসি থেকেই স্বল্প খরচে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন তিনি। শ্রমিকরা জানান "লবণাক্ত পানিতে প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। দীর্ঘসময় পানিতে থাকায় শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয়।"

স্বাস্থ্যঝুঁকিতে লবণ শ্রমিকরা: লবণ শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবা

দেওয়া এক স্বাস্থ্যকর্মী জানান, "বেশিরভাগ শ্রমিক চোখের সমস্যা, চর্মরোগ, শরীর ব্যথা ও পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে আসেন। কিন্তু তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা দেওয়ার সুযোগ খুব সীমিত।" শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটির মেঝেতে বসে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ করেন। ফলে রাতে তার মেরুদন্ড ও কোমরে তীব্র ব্যথা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেও অর্থাভাবে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন না তিনি।

নেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ: দেশের মোট লবণের চাহিদার প্রায় ৯৫ শতাংশ পূরণ করেন কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের নয় উপজেলার শ্রমিকরা। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ লবণ শ্রমিকদের জন্য আলাদা কোনো সুরক্ষার কথা উল্লেখ নেই। International Labour Organization আইএসইসি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৪৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ লবণ শ্রমিক পানিশূন্যতা, চর্মরোগ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। অন্যদিকে ৫২ দশমিক ৬৩ শতাংশ শ্রমিক আক্রান্ত পেশি ও হাড়ের সমস্যায়। এছাড়া প্রায় ২৯ শতাংশ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ওজন বহন, বৈরী আবহাওয়া, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহারেও অনীহা: কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হেলমেট, গ্লাভস বা পিপিই ব্যবহারের কথা বলা হলেও অধিকাংশ শ্রমিক এসব ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। সংশ্লিষ্টদের মতে, সচেতনতার অভাব ও বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

চার ধাপে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ: লবণ উৎপাদনে শ্রমিকদের চারটি ধাপে কাজ করতে হয়। প্রথম ধাপে লবণ মাঠে কাজ, যেখানে বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয় ধাপে গাড়িতে লবণ তোলার সময় দীর্ঘক্ষণ ভারী বোঝা বহন করতে হয়। তৃতীয় ধাপে কারখানায় অপরিশোধিত লবণের মধ্যে খালি পায়ে কাজ করতে হয়। আর শেষ ধাপে নারী-পুরুষ উভয়েই মাটিতে বসে প্যাকেটজাতকরণের কাজ করেন।

দীর্ঘসময় লবণাক্ত পানিতে কাজ করার কারণে অনেকের শরীরে ঘা সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ শ্রমিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে নাপা, প্যারাসিটামল কিংবা স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের ওপর নির্ভর করেন।

স্বাস্থ্যসেবা এখনো নাগালের বাইরে: গবেষণায় দেখা গেছে, লবণ শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এছাড়া হাসপাতালভিত্তিক চিকিৎসাসেবাও তাদের নাগালের বাইরে। মাত্র ২০ দশমিক ২৮ শতাংশ শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পান। বিপরীতে প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা তাদের জন্য সহজলভ্য নয়।

দেশের লবণ শিল্প টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও লবণ শ্রমিকরা এখনো রয়ে গেছেন অবহেলিত। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

থ. বাংলাদেশের জাহাজভাঙা শিল্প: শ্রমিক, পরিবেশ ও টিকে থাকার সংকট-

হংকং কনভেনশন ও বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ: আন্তর্জাতিক হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে জাহাজভাঙা শিল্পকে পরিবেশবান্ধব করতে হবে। অন্যথায় বিদেশি জাহাজ মালিকরা বাংলাদেশে জাহাজ পাঠানো বন্ধ করতে পারেন। ফলে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত বড় ধরনের সংকটে পড়তে পারে।

পরিবেশবান্ধব জাহাজভাঙা প্রতিষ্ঠানের সূচনা: ২০১৭ সালে পিএইচপি শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড দেশের প্রথম পরিবেশবান্ধব জাহাজভাঙা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক সনদ লাভ করে। বর্তমানে দেশে ২৪৮টি জাহাজভাঙা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫টি সচল রয়েছে। শিল্পমালিকদের সংগঠন বিএসবিআরএর আশঙ্কা, এই খাতে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার শ্রমিক এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল আরও বহু মানুষ জীবিকার সংকটে পড়বেন।

পরিবেশবান্ধব হতে আর্থিক সংকট: শ্রম অধিকারকর্মীদের মতে, প্রচলিত পদ্ধতিতে জাহাজভাঙা তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় মালিকদের কম বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু পরিবেশবান্ধব ইয়ার্ড তৈরি করতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। ব্যাংকগুলো সাধারণত জাহাজ কেনার জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিলেও শিপইয়ার্ড উন্নয়নে ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। ফলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব রূপান্তর করতে পারছে না।

বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমখাত: প্রচলিত জাহাজভাঙা শিল্পে শ্রমিকরা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলোর একটিতে নিয়োজিত। অধিকাংশ শ্রমিকই নিম্নবিত্ত ও অদক্ষ। তারা হেলমেট, গ্লাভস, বুটসহ মৌলিক সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই কাজ করেন। জাহাজ কাটার সময় বিস্ফোরণ, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম-এর তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৩১ শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন তিন শতাধিক শ্রমিক।

বিষাক্ত উপাদান ও স্বাস্থ্যঝুঁকি: জাহাজে থাকা অ্যাসবেস্টস, সীসা, পিসিবি ও টিবিটির মতো বিষাক্ত উপাদান শ্রমিকদের জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকি। এসবের সংস্পর্শে এসে শ্রমিকরা শ্বাসকষ্ট, ত্বকের রোগ এবং ক্যানসারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অথচ তাদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসাসুবিধা নেই।

শ্রমিকদের মজুরি ও অধিকার সংকট: জাহাজভাঙা শিল্পে অধিকাংশ শ্রমিকের

নিয়োগপত্র নেই। তারা শ্রম আইন অনুযায়ী সবেতন ছুটি, উৎসব বোনাস কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরিও বাস্তবায়িত হয়নি। ২০ বছরের অভিজ্ঞ একজন শ্রমিক ঘণ্টাপ্রতি মাত্র ৫৫ টাকা পান। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করে তার আয় হয় ৪৪০ টাকা, যা ওই কারখানার সর্বোচ্চ মজু-রি। অথচ সরকার ঘোষিত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৮০০ টাকা। এ শিল্পে সাত ধরনের শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দক্ষ ফিটার শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশি আয় করেন। অন্যদিকে কাটার বা ওয়্যারশ্রমিকদের দৈনিক আয় মাত্র ২৪০ থেকে ৩৫০ টাকা।

শ্রমিক কলোনির অমানবিক জীবন: জাহাজ-ভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের জীবনযাপন অত্যন্ত দুর্বিষহ। চট্রগ্রামের কুমিরা, সোনাইছড়ি, ভাটিয়ারী ও সলিমপুর ইউনিয়নে অন্তত ৬০টি শ্রমিক কলোনি রয়েছে। এসব কলোনির বেশিরভাগই বসবাসের অনুপযোগী। ছোট ছোট ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হয় শ্রমিকদের। নেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস কিংবা নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা। শীত, বর্ষা--সব ঋতুতেই মাটিতে বিছানা করে থাকতে হয় তাদের।

পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পরিবর্তন: পরিবেশবান্ধব জাহাজ-ভাঙা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ তুলনামূলক ভালো। শ্রমিকদের মতে- নিয়মিত মজুরি দেওয়া হয়, উৎসব ভাতা পাওয়া যায়, নিরাপদ পরিবেশে কাজ করা সম্ভব হয়, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কম থাকে। এ কারণে শ্রমিকদের অনেকেই পরিবেশ-বান্ধব প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান: ২০২৪ সালে জাহাজ ভাঙার জন্য বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রথম পছন্দের দেশ ছিল। এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্মের তথ্য-মতে, ২০২৪ সালে বিশ্বে ভাঙা ৪০৯টি জাহাজের মধ্যে ১৩০টি বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এটি দেশের অর্থনীতিতে এ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের জাহাজভাঙা শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও শ্রমিকদের জীবন এখনো চরম ঝুঁকি, দারিদ্র্য ও অনিরাপত্তার মধ্যে আবদ্ধ। পরিবেশবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব রূপান্তর ছাড়া এই শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। জাহাজভাঙা শিল্পকে টেকসই ও মানবিক করতে প্রয়োজন- সব ইয়ার্ডকে পরিবেশবান্ধব মানদন্ডে আনা, শ্রমিকদের সুরক্ষা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও বীমা চালু করা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়া এবং পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের জন্য সহজ ঋণ ও সরকারি প্রণোদনা প্রদান।

দ. বাংলাদেশের চা শ্রমিক: সামান্য ভাতা, দীর্ঘ সংকট-

শ্রমিকদের সংখ্যা ও কর্মপরিধি: দেশে বর্তমানে ১৭০টি চা বাগান রয়েছে। এসব বাগানে-প্রায় ৯৭ হাজার স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন, এছাড়া মৌসুমি ও অস্থায়ীভাবে আরও ৪০ থেকে ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সব মিলিয়ে দেশে চা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার।

চা শ্রমিকদের জন্য নতুন বাজেট বরাদ্দ: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার মোট ১১২ কোটি ৩১ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই বরাদ্দকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায়-

প্রথমবারের মতো মাসিক নগদ ভাতা: ১ লাখ ৩৭ হাজার চা শ্রমিককে প্রতি মাসে ৬৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। যদিও এই ভাতা শ্রমিকদের জন্য কিছুটা সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, তবে বর্তমান বাজারদর ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় এটি খুবই অপ্রতুল বলে মনে করছেন শ্রমিক নেতারা।

শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি: চা শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে শিক্ষা কল্যাণ অনুদান বা উপবৃত্তি চালু রাখা হয়েছে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে এই সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমিক পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১ হাজার ৫০০ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

চা শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি: দেশে চা-শিল্পের প্রায় ১৮৫ বছরের ইতিহাসে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখন মাত্র ১৭৮ টাকা ৫০ পয়সা। মজুরি বৃদ্ধির ইতিহাস: ২০১৫ সালে দৈনিক মজুরি ছিল ৮৫ টাকা, ২০২২ সালের বড় আন্দোলনের পর মজুরি বাড়িয়ে ১৭০ টাকা করা হয়, বর্তমানে ৫ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা পাচ্ছেন প্রায় ১৭৯ টাকা। আগস্টে আবারও ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির কথা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিক মজুরি: চা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। শ্রীলংকা-এ দৈনিক মজুরি প্রায় ৫৫০ টাকা, কেনিয়া-তে প্রায় ৪৮৩ টাকা, ভারত-এ প্রায় ২৫৬ টাকা, আর বাংলাদেশ-এ মাত্র ১৭৯ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও মালিকদের সংকট: চা শিল্পে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় পিছিয়ে থাকায় প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না বাংলাদেশের চা খাত। অন্যদিকে নিলামে চায়ের দাম আশানুরূপ না হওয়ায় বাগান মালিকরা ব্যয় কমাতে শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধার ওপর চাপ দিচ্ছেন।

সীমিত সুবিধা ও মানবেতর জীবন: চা শ্রমিকরা সাপ্তাহিক রেশন হিসেবে ভর্তুকি মূল্যে ৩ দশমিক ৩ কেজি আটা বা চাল পান। পাশাপাশি বাসস্থান, কিছু কৃষিজমি, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্কুল সুবিধা থাকলেও সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবার এখনও- অপুষ্টি,

নিম্নমানের বাসস্থান, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, এবং শিক্ষাবঞ্চনার মধ্যে জীবনযাপন করছে। শ্রমিকদের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস।

চা খাতে বহুমুখী সংকট: বাংলাদেশের চা খাত বর্তমানে নানা সংকটের মুখোমুখি। নগদ অর্থ সংকটের কারণে অন্তত ৩১টি চা বাগানে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক বাগানে এক সপ্তাহ মজুরি দেওয়া হলেও পরের সপ্তাহে তা বকেয়া রাখা হচ্ছে। এতে শ্রমিকদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এই জনগোষ্ঠী এখনো ন্যায্য জীবনমান থেকে বঞ্চিত। বছর বছর সামান্য মজুরি বৃদ্ধি হলেও তাদের জীবনযাত্রার বাস্তব পরিবর্তন খুব কমই ঘটছে। চা শ্রমিকদের জন্য নতুন ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইতিবাচক উদ্যোগ হলেও তা এখনও পর্যাপ্ত নয়। ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নিরাপদ বাসস্থান ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের জীবনমানের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হবে না।

ধ. এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও শিক্ষকদের জীবনসংগ্রাম-

আন্দোলনের মুখে সরকারের সিদ্ধান্ত: রাজধানীতে টানা ১০ দিন আন্দোলনের পর সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট-এর ব্যানারে শিক্ষক-কর্মচারীরা বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। ১২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে চলা আন্দোলনের পর শিক্ষক নেতারা কর্মবিরতি ও সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি: সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এই সিদ্ধান্ত দুই ধাপে কার্যকর হবে। প্রথম ধাপে- নভেম্বর ২০২৫ মাস থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা- মূল বেতনের সাড়ে ৭ শতাংশ, অথবা ন্যূনতম ২ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন। দ্বিতীয় ধাপ- জুলাই ২০২৬ মাস থেকে- বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে, অথবা ন্যূনতম ২ হাজার টাকা নিশ্চিত করা হবে।

চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা অপরিবর্তিত: সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী--চিকিৎসা ভাতা মাসিক ৫০০ টাকাই থাকছে, এবং উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশই থাকবে। অর্থাৎ আপাতত এই দুটি ভাতা বাড়ানো হয়নি।

নতুন বাড়ি ভাড়া ভাতার কাঠামো: জুলাই ২০২৬ থেকে ১৫ শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া কার্যকর হলে বিভিন্ন পদে শিক্ষকরা পাবেন--অধ্যক্ষ: ৭,৫০০ টাকা, উপাধ্যক্ষ: ৬,৪৫০ টাকা,সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-৬): ৫,৩২০ টাকা,সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-৮): ৩,৪৫০ টাকা,প্রভাষক: ৩,৩০০ টাকা

প্রধান শিক্ষক: ৪,৩৫০ টাকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক: ৩,৪৫০ টাকা, সিনিয়র শিক্ষক: ৩,৩০০ টাকা, সহকারী শিক্ষক (গ্রেড-১০): ২,৪০০ টাকা ও সহকারী শিক্ষক (১১তম গ্রেড): ১,৮৭৫ টাকা, তবে ন্যূনতম ২ হাজার টাকা পাবেন।

নন-এমপিও শিক্ষকদের মানবেতর জীবন: দেশের বিপুলসংখ্যক নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক এখনো বেতনহীন বা অপ্রতুল আয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। শিক্ষকদের অভিযোগ- শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমলে আয় কমে যায়, মাস শেষে ন্যূনতম জীবনধারণের টাকাও হাতে থাকে না, পরিবারের প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভাবের কারণে অনেক শিক্ষককে--দিনমজুরের কাজ করতে, অটোরিকশা চালাতে, কিংবা ফুটপাতে ব্যবসা করতে হচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নন-এমপিও: বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে মোট ৯২ হাজার ৩৯২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার ১০৪টি, আর নন-এমপিও প্রতিষ্ঠান ৬৬ হাজার ২৮৭টি। অর্থাৎ প্রায় ৭৩ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও সুবিধার বাইরে।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব: নন-এমপিও শিক্ষকদের আর্থিক অনিশ্চয়তা শিক্ষাব্যবস্থার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অপ্রতুল আয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে শিক্ষকরা মানসিক চাপের মধ্যে থাকছেন, যা পাঠদানের মানেও প্রভাব ফেলছে।

দ্রব্যমূল্যের চাপে শিক্ষকদের সংকট: বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে নামমাত্র বেতনে জীবনযাপন করা শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, সন্তানের পড়াশোনা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি কিছুটা স্বস্তি দিলেও দেশের বিপুলসংখ্যক নন-এমপিও শিক্ষক এখনও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন, সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত না হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

ন. সুতা শিল্পে সংকট: বন্ধ ৫০ স্পিনিং মিল, কর্মহীন দুই লাখ মানুষ-

বন্ধ হয়ে গেছে ৫০টি স্পিনিং মিল: বিদেশি সুতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশের ৫০টি স্পিনিং মিল ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে প্রায় দুই লাখ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারগুলো এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

ভারতীয় সুতার আমদানিতে বাড়ছে চাপ: ভারত থেকে সুতা আমদানির পরিমাণ গত ২২ মাসে ১৩৭ শতাংশ বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভারতীয় রপ্তানি-কারকেরা প্রতি কেজি সুতায় প্রায় ৩০ সেন্ট কম দামে বাংলাদেশে সুতা ডাম্পিং করছেন। ফলে দেশীয় সুতা শিল্প তীব্র

প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে।

অবিক্রীত সুতার বিশাল মজুদ: দেশের স্পিনিং মিলগুলোতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। এতে উদ্যোক্তাদের ওপর বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়ায়-ব্যাংক ঋণ পরিশোধে সমস্যা হচ্ছে,নতুন বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, এবং অনেক কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি: সংকট মোকাবিলায় ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে-সুতা রফতানিতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা, রফতানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-এর আকার বৃদ্ধি,এবং ব্যাংক ঋণের সুদহার কমানো।তাদের মতে, এসব সহায়তা না পেলে দেশীয় সুতা শিল্প আরও বড় সংকটে পড়বে।

নতুন শ্রম আইন নিয়ে উদ্বেগ: সরকার নতুন শ্রম আইনে স্বাক্ষর করেছে, যেখানে মাত্র ২০ জন শ্রমিক একত্রিত হয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন। শিল্প মালিকদের আশঙ্কা-একটি কারখানায় অনেকগুলো শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে, এতে শ্রম অসন্তোষ বাড়ার ঝুঁকি থাকবে, এবং কারখানার শৃঙ্খলা ও উৎপাদন পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পোশাক শিল্পের সঙ্গে সুতা খাতের সম্পর্ক: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প মূলত দেশীয় সুতা ও কাপড় শিল্পের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, পোশাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সুতা উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী রাখা অত্যন্ত জরুরি। দেশীয় সুতা শিল্প দুর্বল হয়ে পড়লে-আমদানিনির্ভরতা বাড়বে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, এবং বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়বে।

শ্রমিকদের জীবনসংকট: স্পিনিং মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক আয়হীন হয়ে পড়েছেন। অনেক পরিবার এখন- বেকারত্ব,ঋণের চাপ,এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটে ভুগছে। দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের অনেকের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগও নেই।

বাংলাদেশের সুতা শিল্প বর্তমানে আমদানি প্রতিযোগিতা, আর্থিক সংকট ও বাজার অনিশ্চয়তার মুখে কঠিন সময় পার করছে। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আরও কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা দেশের পোশাক শিল্প ও সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প. দেশের পরিবহন শ্রমিকদের জীবন: দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অনিশ্চয়তা ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি-

নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টাহীন শ্রমজীবন: দেশের পরিবহন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই। অধিকাংশ চালক ও সহকারীদের দিনে গড়ে ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত টানা গাড়িতে থাকতে হয় তাদের। যান্ত্রিক যানবাহনের মতোই শ্রকিদেরও পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ থাকে না। ফলে শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ তাদের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতিরিক্ত কাজের প্রভাব ও দুর্ঘটনা: পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও বিশ্রামের অভাবে চালকেরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে সড়ক নিরাপত্তায়। চুক্তিভিত্তিক কাজ এবং প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি চালানোর প্রবণতার কারণে চালকেরা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে বাধ্য হন। এতে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।

কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু পরিবহন খাতে: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর জরিপ অনুযায়ী, দেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার গত এক দশকে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক মারা গেছেন পরিবহন খাতে। ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মোট ৭৩৬ জন শ্রমিক নিহত হন। এর মধ্যে-পরিবহন খাতে নিহত হয়েছেন ২৯২ জন শ্রমিক। অন্য এক জরিপ অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ মাসেই সড়ক দুর্ঘটনায় ১২১ জন পরিবহন চালক নিহত হয়েছেন।

শ্রমিকদের অনিশ্চিত চাকরি: পরিবহন শ্রমিকদের অধিকাংশই লিখিত নিয়োগ-পত্র ছাড়া কাজ করেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে মৌখিক চুক্তিতে তারা গাড়ি চালান। ফলে-চাকরির নিরাপত্তা থাকে না, ছুটি নিলে আয় বন্ধ হয়ে যায়,অসুস্থ হলেও কোনো আর্থিক সহায়তা মেলে না। মালিকরা চাইলে যে কোনো সময় শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দিতে পারেন।

আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই: বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী- একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবেন না, বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো যাবে। কিন্তু বাস্তবে পরিবহন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যত মানা হয় না।

দূরপাল্লার পরিবহনে চরম শ্রমচাপ: বিলসের তথ্যমতে, দেশে দূরপাল্লার গণপরিবহনে প্রায় ১ লাখ ৮৪ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তাদের মধ্যে- প্রায় সবাইকে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়, প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৫ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন, এবং ২০ শতাংশ শ্রমিক কোনো নিয়মিত বিরতি ছাড়াই কাজ চালিয়ে যান।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব: পরিবহন শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চাকরির নিশ্চয়তার অভাব এই পেশাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ২০১১ সালে সরকার পরিবহন খাতকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিলেও এখনো তার বাস্তবায়ন হয়নি। এটি বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের অধিকার ও সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারত।

কম মজুরিতে কঠিন জীবন: অনেক পরিবহন শ্রমিক দিন শেষে মাত্র ৮০০ টাকা মজুরি পান। দীর্ঘ যানজট, প্রচন্ড গরম, ধোঁয়া-দূষণ এবং টানা কাজের চাপ তাদের

জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

২০১৮ সালের ২৯ জুলাই রাজধানীতে বাসচাপায় শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার পর নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯ আগস্ট থেকে চুক্তিভিত্তিক বাস চালানো বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। পরে শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয় এবং ২০২০ সালের ২১ জুলাই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

মজুরি বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী, চালকদের বেতন লাইসেন্স ও এলাকার ভিত্তিতে ১৪ হাজার ৪৪০ টাকা থেকে ২০ হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কনডাক্টর, সুপারভাইজার, চেকার, বুকিং ক্লার্ক, গাইড ও ক্যাশিয়ারদের সর্বনিম্ন বেতন বিভাগীয় শহরে ১৩ হাজার এবং অন্যান্য এলাকায় ১২ হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। হেলপারদের বেতন বিভাগীয় শহরে ১০ হাজার ৭৫০ এবং অন্যান্য এলাকায় ১০ হাজার ১০০ টাকা করা হয়।

মজুরি বোর্ড জানায়, নির্ধারিত মজুরির কম বেতন দেওয়া যাবে না এবং প্রতিবছর মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে বেতন বাড়বে। তবে আড়াই বছর পরও এই নিম্নতম মজুরি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি বলে শ্রমিক নেতারা অভিযোগ করেন।

পরিবর্তনের আশ্বাসঃ পরিবহন মালিকপক্ষের দাবি, দূরপাল্লার কিছু কোম্পানিতে ইতোমধ্যে নিয়োগপত্র, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও বেতন-ভাতার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শহর ও শহরতলির পরিবহনেও ধীরে ধীরে এসব নিয়ম কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। তারা শ্রমিকদের জন্য আর্থিক তহবিল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথাও বলছেন।

বাংলাদেশের পরিবহন শ্রমিকরা দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ, কম মজুরি ও চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। শ্রম আইন বাস্তবায়ন, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া এই খাতের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতেও শ্রমিকবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

ফ. ট্রেড ইউনিয়নঃ শ্রমিক অধিকার, গণতন্ত্র ও নতুন বাস্তবতা-

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নতুন সিদ্ধান্তঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, যেকোনো প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৫ জন শ্রমিক থাকলেই ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার আরও সহজ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন--কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নকে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারবে না, এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হবে, এবং সামাজিক ক্লাবগুলোকেও শ্রম আইনের আওতায় আনা হবে।

আন্তর্জাতিক বাস্তবতা ও বাংলাদেশের অবস্থানঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-র 'বেটার ওয়ার্ক' কর্মসূচির তথ্যমতে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৭ থেকে ২০ জন শ্রমিক একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করতে পারেন। বাংলাদেশে আগে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন লাগত। পরে তা কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়। বর্তমানে দেশে মোট ৯ হাজার ৯৩৭টি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে রয়েছে ১ হাজার ৩৮১টি ইউনিয়ন।

কার্যকর ইউনিয়নের সংকটঃ শ্রমিক নেতাদের মতে, নিবন্ধিত ইউনিয়নের সংখ্যা বেশি হলেও কার্যকর সংগঠন খুব কম। তাদের দাবি- তৈরি পোশাক খাতের ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ১০০টিরও কম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, আর মাত্র প্রায় ৪০টি সংগঠন 'দরকষাকষির প্রতিনিধিত্বকারী' বা সিবিএ মর্যাদা ভোগ করছে। অর্থাৎ কাগজে ইউনিয়ন থাকলেও বাস্-বে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় অনেক সংগঠন কার্যকর নয়।

মালিকপক্ষের উদ্বেগ: কারখানা মালিক ও শ্রম আইন বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইউনিয়ন গঠনের শর্ত অত্যন্ত সহজ করলে তৈরি পোশাক শিল্পে অস্থিরতা বাড়তে পারে। তাদের মতে- একটি কারখানায় অতিরিক্ত সংখ্যক ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারে, এতে শ্রম বিরোধ ও দলাদলি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, এবং উৎপাদন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে।

নিবন্ধন ও প্রশাসনিক জটিলতা: শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম বলেন, শ্রম আইনে ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন ছাড়া কোনো ইউনিয়ন আইনগতভাবে কার্যকর হয় না। তিনি অভিযোগ করেন- ইউনিয়ন গঠনের পরও শ্রম দপ্তরের জটিল-তায় অনেক সংগঠন নিবন্ধন পায় না, অনেক শ্রমিক প্রতিশোধমূলক চাকরিচ্যুতির শিকার হন, কিন্তু তারা কার্যকর প্রতিকার পান না।

উচ্চ আদালতের নির্দেশনা: ২০১৪ সালের ৮ জুলাই উচ্চ আদালতের এক নির্দেশনায় বলা হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ৩১৭(৪)(ঘ) ধারা অনুযায়ী শ্রম পরিচালক বা তার মনোনীত কর্মকর্তা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন তদারকি করবেন। এই কর্মকর্তার দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে- সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা,নির্বাচন কমিশন গঠন পর্যবেক্ষণ, সঠিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত নিশ্চিত করা,মনোনয়ন যাচাই, গোপন ব্যালটে নির্বাচন আয়োজন,ফলাফল ঘোষণা ও দায়িত্ব হস্তান্তর তদারকি করা। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে।

স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা: অনেক সময় শ্রমিকদের না জানিয়ে হঠাৎ সম্মেলনের নামে লোকদেখানো নির্বাচন আয়োজন এবং নতুন কমিটি ঘোষণা করার অভিযোগ ওঠে। এটি শ্রম আইন ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞদের মতে- ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে, নির্বাচন হতে হবে স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও গঠনতন্ত্রসম্মত, অন্যথায় নেতৃত্বের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

সিবিএ ও ইউনিয়নের ভারসাম্য: শ্রম সংস্কার কমিশনের মতে, শুধু বেশি সংখ্যক ইউনিয়নের অনুমতি দিলেই হবে না। কার্যকর সিবিএ নির্বাচন না থাকলে বড় ইউনিয়নও অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারা মনে করেন- সিবিএর কাজের পরিসর আইনে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, এবং ইউনিয়নগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিক আন্দোলনের ইমেজ সংকট: বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন বর্তমানে নানা সমালোচনার মুখে রয়েছে। দালালি, পেশিশক্তি, চাঁদাবাজি, দলবাজি ও টেন্ডারবাজির অভিযোগে ট্রেড ইউনিয়নের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করছেন শ্রম অধিকারকর্মীরা। তাদের মতে, শ্রমিক আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন- স্বচ্ছ নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, জবাবদিহিতা, এবং শ্রমিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণ।

ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায্যতার প্রতীক। তাই ইউনিয়ন গঠন ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অবশ্যই আইন, গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। শ্রমিকদের সংগঠন যেন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে-এই নীতিই হতে পারে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তি।

ব. শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ঝুঁকি: একটি সার্বিক চিত্র-

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ: শ্রম সংস্কার কমিশন আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একক ও সেক্টরভিত্তিক জাতীয় মানদন্ড প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে- সরকার, মালিক, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন, প্রতিটি কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নীতি চালু, নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রদান, রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা, বিপজ্জনক কাজের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ।

রাসায়নিক দূষণ ও পিফাস (PFAS- Per- and Polyfluoroalïl Substances) সংকট: দেশের চামড়া ও টেক্সটাইল খাতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পিফাস (চঋঅঝ) ব্যবহার হচ্ছে। এর প্রভাবে - বর্জ্যের মাধ্যমে মাটি ও পানি দূষণ, টেক্সটাইল এলাকার ৮৭% পৃষ্ঠজল ও ৭৫% কলের পানিতে পিফাস শনাক্ত ও সাভারের কর্ণতলী নদীতে ডাচ সীমার চেয়ে ৫৪ হাজার গুণ বেশি মাত্রা ধারণ করেছে। এর ফলে **মানবদেহে স্বাস্থ্যঝুঁকি:** ক্যান্সার, লিভারের ক্ষতি, থাইরয়েড সমস্যা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এখনো পিফাস নিয়ন্ত্রণে জাতীয় আইন নেই এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নীতিমালাও গ্রহণ করা হয়নি।

শিল্পায়ন ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ: দ্রুত শিল্পায়ন পিফাস দূষণ বাড়াচ্ছে। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বৈশ্বিক সমস্যা। প্রস্তাবিত করণীয় হিসেবে-কেমিক্যাল আমদানির রেজিস্ট্রেশন ও মনিটরিং করা; টেক্সটাইল ও প্রসাধনী শিল্পকে নজরদারিতে আনা;দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার গুরুত্ব: নিরাপদ কর্মপরিবেশ শুধু শ্রমিক নয়, প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী- বছরে প্রায় ২.৩ মিলিয়ন মানুষ কর্মক্ষেত্র-সম্পর্কিত দুর্ঘটনা বা রোগে মারা যান; লক্ষাধিক মানুষ স্থায়ীভাবে পঙ্গু বা দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভোগেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নীতিমালা: বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পায়-

ঝুঁকি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা: সম্ভাব্য ঝুঁকি আগেই চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

নেওয়া। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ: নিরাপদ কাজের পদ্ধতি শেখানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ। স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ: নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। নিয়মিত পরিদর্শন: নিরাপত্তা সরঞ্জাম, ফায়ার সেফটি ও জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা যাচাই। শ্রমিকদের অংশগ্রহণ: নিরাপত্তা নীতিমালা বাস্তবায়নে শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।

ডিটারজেন্ট শিল্পে স্বাস্থ্যঝুঁকি: ডিটারজেন্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে অ্যালার্জি, শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ ও ইনফেকশন, চর্মরোগ, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির ক্ষতি, ক্যান্সারের ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধে তাদের মাঝে নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার সীমিতকরণ করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের ঝুঁকি: অগ্নিকান্ড ভবন ধস বা রাসায়নিক বিস্ফোরণে প্রথম সাড়া দেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। গত এক দশকে- ২৫ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী নিহত, প্রায় ৩৮৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এধরণের ঘটনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশকে নির্দেশ করে।

নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার: গার্মেন্টস খাতে নারী শ্রমিকদের অবস্থা উদ্বেগজনক। বিশেষ করে- অধিকাংশের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে, প্রায় ৬৫% নারীর অল্প বয়সে প্রথম গর্ভধারণ, প্রতি ৩ জনে ১ জন অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের শিকার, প্রতি ৪ জনে ১ জন গর্ভপাত বা মেনস্ট্রুয়াল রেগুলেশন অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটি আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত একটি গবেষণায় উঠে এসেছে।

গণপরিবহনে নারীদের হয়রানি: বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্কের তথ্য অনুযায়ী-৮৩% নারী গণপরিবহনে শারীরিক ও মানসিক হয়রানির শিকার বাসে কাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে, নারী যাত্রীদের প্রতি বৈষম্য ও অনিচ্ছা দেখা যায়। বেসরকারি সংস্থা আঁচল ফাউন্ডেশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে- ৬৪% নারী যাত্রী হয়রানির শিকার। ৪৬.৫% যৌন হয়রানি, ১৫.৩% বুলিং, ১৫.২% বৈষম্য, ১৪.৯% লিঙ্গবৈষম্য, ৮.২% বডি শেমিং। এপ্রেক্ষিতে নারীরা নিরাপদ চলাচলের জন্য নারীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) উদ্যোগে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা হয়। ২০১৫ সালেও এ সেবায় ১২টি বাস ছিল। তবে বর্তমানে ৯টি রুটে মাত্র ৯টি বাস চলছে বলে জানিয়েছেন বিআরটিসির কর্মকর্তারা। নারীবান্ধব বাস সার্ভিস, আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা দাবী করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও শ্রমিকের ঝুঁকি: বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা, নির্মাণ, পরিবহন ও সেবাখাতে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এখনো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, ভবনধস, নিরাপত্তা সরঞ্জামের অভাব এবং দুর্বল তদারকির কারণে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক প্রাণ হারাচ্ছেন। ২০২৫ সালে ৭১৩টি দুর্ঘটনায় ৮০২ শ্রমিক নিহত হওয়ার তথ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতা নির্দেশ করে। বিশেষ করে--পরিবহন খাতে: ৩৮৫ জন, সেবা খাত: ১৪৫ জন, নির্মাণ: ১২০ জন, উৎপাদনশীল শিল্প: ৫৮ জন, কৃষি: ৯৪ জন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করে বেসরকারি সংস্থা সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির (এসআরএস) এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। শিল্পায়নের পাশাপাশি যদি নিরাপত্তা ও মানবিক দিক উপেক্ষিত হয়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সমাজ ও অর্থনীতির জন্য বড় সংকট তৈরি করবে।

ভ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত: সংকট, শোষণ ও করণীয়

বৈশ্বিক শ্রমবাজারের সংকট: ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বৈশ্বিক ঋণ সংকট বিশ্ব শ্রমবাজারে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৪০ কোটি ২০ লাখ মানুষ কাজ করতে চাইলেও উপযুক্ত কাজ পাচ্ছেন না। এর মধ্যে ১৮ কোটি ৬০ লাখ মানুষ বেকার। আবার অনেকেই পারিবারিক দায়িত্ব, কম মজুরি বা পছন্দসই কাজের অভাবে শ্রমবাজার থেকে দূরে থাকছেন।

বাংলাদেশের অভিবাসন বাস্তবতা: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ জীবিকার সন্ধানে বিদেশে যান। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তবে অভিবাসন খাত দীর্ঘদিন ধরে দালালচক্র, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সংকটে রয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সি ও সিন্ডিকেটের বিস্তার: ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৩১টি নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যেখানে আগের ৩০ বছরে অনুমোদিত লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ৯৯১টি। এই খাতে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

শ্রমবাজার বন্ধ ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা: মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার একাধিকবার বন্ধ হয়েছে মানব পাচার ও অনিয়মের অভিযোগে। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচার: বৈধপথে সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় অনেকে অবৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছেন। লিবিয়া ও ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে বহু বাংলাদেশি প্রতারণা, নির্যাতন, বন্দিদশা ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন। ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়া ৯৩ শতাংশ বাংলাদেশি ক্যাম্পে বন্দি হয়েছেন এবং ৭৯ শতাংশ শারীরিক নির্যাতনের শি-কার হয়েছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন

সংস্থার (আইওএম) 'ডিসপেসমেন্ট ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সমুদ্রপথে ইউরোপে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২০ হাজার ৪৬২ জন বাংলাদেশি প্রচলিত বৈধ পথের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেছেন। অথচ গত বছর একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৩০৪ জন।

দালালচক্রের তিন স্তর-

স্থানীয় দালাল: গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দালালরা বিদেশে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে যুবকদের প্রলুব্ধ করে।

মধ্যস্বত্বভোগী চক্র: দেশে অবস্থানরত কিছু ব্যক্তি ভিসা, টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্রের ব্যবস্থা করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়।

বিদেশভিত্তিক সিন্ডিকেট: লিবিয়া ও অন্যান্য দেশে অবস্থানরত মূল পাচারকারীরা অভিবাসন প্রত্যাশীদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়সহ নানা নির্যাতন চালায়।

অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়: সরকার নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি টাকা ব্যয় করতে হয় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের। অনেকেই জমি বিক্রি বা উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বিদেশে যান। গড়ে একজন শ্রমিকের বিদেশ যেতে প্রায় ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়।

আধুনিক দাসত্বের চিত্র: বিদেশে গিয়ে অনেক শ্রমিক আধুনিক দাসত্বের শিকার হচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে- কম বেতন দেওয়া, বেতন আটকে রাখা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, চলাফেরায় বাধা ও অতিরিক্ত কাজ করানো। গবেষণা অনুযায়ী, ৯৯ শতাংশ শ্রমিক অন্তত একটি শোষণমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন।

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকি: বিদেশে গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত নারী শ্রমিকরা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ গোপন থাকে। সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার ও অন্যান্য দেশে নারী শ্রমিকদের আত্মহত্যা ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু: বিগত চার দশকে ৫৭ হাজার ২১৬ জন প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফিরেছে। এর মধ্যে গত এক দশকেই ৩৮ হাজারের বেশি। অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ- হৃদরোগ,উচ্চ রক্তচাপ,মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, আত্মহত্যা, কর্মস্থল দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। মৃত্যুবরণকারী অভিবাসীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা অথবা হত্যার শিকার হয়েছেন। ২০২৪ সালে মোট ৪ হাজার ৮১৩ জন অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফিরেছে। এর মধ্যে ৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৩ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। এই পরিসংখ্যান অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ, মানসিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাবকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তাই বিদেশগামী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা ও মানবিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

দক্ষতার অভাব ও শ্রমবাজার সংকট: সৌদি আরব বর্তমানে ৩৩টি খাতে দক্ষতার সনদ বাধ্যতামূলক করেছে। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশি শ্রমিকরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। দক্ষ শ্রমিকদের বেতন তুলনামূলক বেশি হলেও অধিকাংশ কর্মী অদক্ষ অবস্থায় বিদেশে যাচ্ছেন।

সৌদি আরবে কাফালা ব্যবস্থার বিলুপ্তি: সৌদি আরব কাফালা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে নতুন চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা চালু করেছে। নতুন ব্যবস্থায়- শ্রমি-করা চাকরি পরিবর্তন করতে পারবেন, এক্সিট ভিসা ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন, আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। এটি শ্রমিক অধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কুয়েত ও আমিরাতের নতুন উদ্যোগ: কুয়েতগামী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য প্রথমবারের মতো ন্যূনতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ করেছে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাস। ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভিসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিয়োগদাতাকে নির্ধারিত বেতন কাঠামো অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এই শর্ত পূরণ না হলে কোনো ভিসা নবায়ন করা হবে না। নতুন কাঠামো অনুযায়ী- গৃহকর্মীর জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ কুয়েতি দিনার। বাসার ড্রাইভার ও রাঁধুনির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ দিনার। সরকারি চুক্তির আওতায় আকুদ হুকমি খাতের অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন ৯০ দিনার। আকুদ আহলি খাতের অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১২০ দিনার নির্ধারণ করা হয়েছে। দক্ষ ড্রাইভারদের জন্য ১২০ দিনার এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১৫০ দিনার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। সব ধরনের বেতনই দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত: গৃহকর্মী নিয়োগে নতুন নিয়ম চালু করেছে, যেখানে শ্রমিকের নিরাপদ পরিবহন ও আবাসনের বিষয় নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গৃহকর্মী নিয়োগে নতুন বিধিমালা।

গৃহকর্মী নিয়োগের পদ্ধতি সহজ ও সুশৃঙ্খল করতে নতুন নিয়োগ-বিধি চালু করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আবেদন, রিসিপ্ট এবং আবেদনের প্রিন্ট কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি মেডিকেল যাচাই-বাছাই এবং আমিরাত আইডি কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন বিধিমালায় গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এজেন্সিগুলোকে বিমানবন্দর থেকে কর্মীদের গ্রহণ করে নিয়োগকারীর বাসভবন পর্যন্ত নিরাপদ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া নিয়োগকারীকে গৃহকর্মীর জাতীয়তা

ও কাজের ধরন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

এজেন্সিগুলোর অতিরিক্ত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে-

নিয়োগের আগে কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিশ্চিত করা, নিয়োগের পর উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, গৃহকর্মী নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোকে মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বৈশ্বিক মজুরি বৈষম্যের চিত্রঃ বিশ্বজুড়ে সিইও বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের গড় বেতন ২০১৯ সালের পর ৫০ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে একই সময়ে শ্রমিকদের গড় মজুরি বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) মহাসচিব লুস ট্রায়াঙ্গেল বলেন, বিশ্বব্যাপী করপোরেশনগুলো যখন রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা করছে, কর ফাঁকি দিচ্ছে এবং দায়বদ্ধতা এড়াতে লবিং চালাচ্ছে, তখনই শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বৈশ্বিক মজুরি বৈষম্য সামান্য কমলেও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এটি এখনো প্রকট। সেসব দেশে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশের তুলনায় ৩ দশমিক ৪ গুণ বেশি।

বিচারহীনতা ও রাজনৈতিক প্রভাবঃ মানব পাচার ও প্রতারণার সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। মামলা হলেও বিচার দীর্ঘসূত্রতায় আটকে যায় এবং অধিকাংশ আসামি জামিনে মুক্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কিন্তু দালালচক্র, অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, মানব পাচার, শ্রমিক নির্যাতন ও দুর্বল নীতিমালার কারণে এ খাত বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর নীতি, সুশাসন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

মোঃ আবু নাছের (মাসুদ)
উর্দ্ধতন কর্মসুচি কর্মকর্তা
নাগরিক উদ্যোগ
anasher75@yahoo.com

তথ্যসূত্রঃ

১. দৈনিক প্রথম আলোঃ ১২, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, ২৩-২৪ এপ্রিল ২০২৫, ১৮ জুন ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

২. সমকালঃ ০৯ ফেব্রুয়ারি, ১১, ১৬ মার্চ, ২৩, ২৫, ২৮ এপ্রিল, ১, ২, ৩, ১২ মে, ৬, ১০ জুলাই, ২২,২৭ অক্টোবর, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

৩. আজকের পত্রিকাঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

৪.বণিক বার্তা

৫. জাগো নিউজঃ ২৪.কম ১ মে, ২৮ এপ্রিল ২০২৫

৬. বাংলা ট্রিবিউনঃ ২৪ এপ্রিল, ১৩ মে, ০১ জুলাই, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১২ ও ২২, ২৩ ও ৩১ অক্টোবর, ২৪ নভেম্বর, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

৭. ঢাকা ট্রিবিউনঃ ১৭ জুন, ১৬ নভেম্বর ২০২৫

৮. কালের কণ্ঠঃ ১৩ জুলাই, ২২ অক্টোবর ২০২৫

৯. বাংলাদেশ প্রতিদিনঃ ১৩ মার্চ, ১৬ জুলাই ২০২৫

১০. The Business Standardঃ ০৩ আগস্ট ২০২৫,

১১. ইত্তেফাকঃ ১১ আগস্ট, ২৮ অক্টোবর ২০২৫

১২. সময়ের আলোঃ ২৪ মে ২০২৫

১৩. যুগান্তরঃ ২৭ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ১, ১২ মে ২০২৫

১৪. আমার দেশঃ ১ মে ২০২৫

১৫. দৈনিক ইনকিলাবঃ ১৯ জানুয়ারি ২০২৫

১৬. মানব কণ্ঠঃ ১ মে ২০২৫

১৭. মানব জমিনঃ ১৪ এপ্রিল ২০২৫

১৮. প্রগতির যাত্রীঃ ৪ আগস্ট ২০২৫

১৯. সাম্প্রতিক দেশকালঃ ০১ অক্টোবর ২০২৫

২০. সময় নিউজঃ এপ্রিল ৩০, ২০২৫

২১. দি ডেইলী স্টারঃ ২৫ এপ্রিল ২০২৫

২২. https://www.itvbd.com/224108ঃ ২৩ জুন

২৩. https://www.bvnwes24.com/national/nwes/175937ঃ ২১ এপ্রিল ২৫

২৪. www.bvnwes24.comঃ ১১ জুলাই ২০২৫

মুল্লুকে চলো আন্দোলন

চা-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার: অতীতের ক্ষত ও বর্তমানের দাবি

মোহন রবিদাস

ব্রিটিশদের মিথ্যা প্রলোভনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা (১৮৩৪-৩৫) চা-শ্রমিকরা ব্রিটিশ চা-বাগান মালিক কর্তৃক অত্যাচার-নিপীড়ন, অবহেলা-নির্যাতন সইতে না-পেরে ১৯২১ সালের এই দিনে নিজ মুল্লুকে (আবাসভূমিতে) ফিরে যাওয়ার জন্য 'মুল্লুকে চলো আন্দোলন' সংঘটিত করেছিল। যেহেতু তাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না, তাই হেঁটেই সিলেট থেকে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাঁট পর্যন্ত আসে। এখানে ব্রিটিশরা তাদেরকে বাধা দেয়। বাধা অতিক্রম করে চা-শ্রমিকরা মেঘনা নদী পার হয়ে নিজের মুল্লুকে যেতে চাইলে ব্রিটিশ গুর্খা বাহিনী তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং হাজার হাজার চা-শ্রমিককে পেট কেটে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। চা-শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয় মেঘনা নদীর পানি। চা-শ্রমিকদের রক্তেমাখা এই ইতিহাসকে স্মরণ করার জন্য প্রতিবছর ২০ মে পালিত হয় 'চা-শ্রমিক হত্যা দিবস'। বর্তমান প্রবন্ধে ভুলিয়ে দেয়া রক্তাক্ত সেই ইতিহাস আবার সামনে আনার পাশাপাশি শতবর্ষ পরের চা শ্রমিকদের পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৬১০ সালে প্রথম চীন থেকে চা আমদানি শুরু করে ওলন্দাজ বণিকরা। ইংরেজ বণিকরাও প্রথম চা আমদানি করত চীন থেকে। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হলে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প চা উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের নজর পড়ে। শুরু হয় বাগান তৈরির কাজ। ১৮৩৫ সালে বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। তার নাম 'রয়েল সোসাইটি'। ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের জন্য অধিকতর অনুসন্ধান করাই এই কমিশনের কাজ। এই কমিটি কাজ শুরু করার আগেই শিলচর এবং করিমগঞ্জে চা-গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বছরই প্রথম চীনের বাইরে বাণিজ্যিকভাবে চা-এর উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৮৩৮ সালে সিলেট ও কাছাড়ে পরীক্ষামূলকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়। ভারতবর্ষে আসামের লখিমপুরে, সিলেট ও কাছাড় জেলায় চা-এর উৎপাদন ব্যাপকতা পায়।

চা-শিল্প যেহেতু শ্রমঘন শিল্প, তাই চা-বাগান গড়ে তুলতে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়। পাহাড়ি জঙ্গল পরিষ্কার

করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ করা প্রাথমিক কাজ। তাছাড়াও দ্রুত বর্ধনশীল আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে দরকার হয় অনেক শ্রমিক। আসামে ১৮২৬ সালে লোকসংখ্যা প্রতিবর্গমাইলে ছিল নয়জন এবং ১৮৫৩ সালে তা বেড়ে হয় প্রতিবর্গমাইলে ৩০ জন। সেই সময়ে আসামের সব প্রাপ্তবয়স্ক লোক দিয়েও তার চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। আর সিলেটে ১৮৫৩ সালে লোকসংখ্যা ছিল প্রতিবর্গমাইলে ২০০ জন। এ ছাড়াও আসাম বা সিলেটের মানুষ চা-বাগানে কাজ করাকে অসম্মান মনে করায় তারা কাজ করতে অনাগ্রহী ছিল।

"ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ('গাছ হিলায়ে গা তো পাইসা মিলেগা' বা 'গাছ নাড়লে টাকা মিলবে') আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে।"

১৮৩০ এর দশকে কম দামে শ্রম কিনে অধিক মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ('গাছ হিলায়ে গা তো পাইসা মিলেগা' বা 'গাছ নাড়লে টাকা মিলবে') আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে। কিন্তু চা-শ্রমিকরা এ অঞ্চলে এসে দেখে, গাছ নাড়লে টাকা পাওয়া তো দূরের কথা; হিংস্র জীবজন্তুর প্রতিকূল পাহাড়-জঙ্গলময় পরিবেশে নিজের জীবন বাঁচানোই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনাহারে-অর্ধাহারে, অসুখে-বিসুখে এক বীভৎস জীবনের সম্মুখীন হয় তারা। সে সময় আড়কাঠি ও গিরমিট প্রথার কারণে চা-ম্যানেজার এই অসহায় মানুষগুলোর ওপর একচ্ছত্র নির্যাতন করার অধিকার পায়। কোনো শ্রমিক ইচ্ছে করলেই চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারতো না। বাগান থেকে পালিয়ে গেলে তাদের ধরে আনা হতো। দেওয়া হতো অমানবিক শাস্তি যা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো না। চাবুক-বুটের-লাথি ছিল এই নিরীহ মানুষগুলোর জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এভাবে মালিকদের হাতে শ্রমিকের মৃত্যুকেও সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হতো। মালিকদের কথ াই সেখানে রাষ্ট্রীয় আদেশ হিসেবে গণ্য হতো। শ্রমিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলতে কোনো কিছু কল্পনাই করা যেত না। বাগানের ভেতরে ছাতা মাথায় হাঁটাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। পুরুষ শ্রমিকদের বেতন চার আনা, নারীদের তিন আনা এবং শিশুদের দুই আনা। তখন চা-বাগানে শিশুশ্রম বৈধ ছিল (যা বর্তমানেও আছে)।

সহজ উপায়ে শ্রমিক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে, শুরু করা হয় শ্রমিক সংগ্রহের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। স্থানীয় জনগণকে কাজে লাগানোর জন্য ১৮৩৪ সালে উল্লেখযোগ্য দুটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ এবং কৃষকদের খামারে উচ্চহারে কর আরোপ। এমনকি পান-সুপারির ওপরও কর আরোপ করা হয়। তবু শ্রমিক সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। চা রপ্তানির উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৮৬৪-৬৫ সালে রেললাইন স্থাপন ও প্রসারিত করে ১৯০৪ সালে চটগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই কারণে স্থানীয় শ্রমিকদের তোষামোদের চেয়ে বাহির থেকে শ্রমিক আমদানি অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই বলে শ্রমিকরা রেল চেপে চা-বাগানে কাজ করতে আসবে-এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সেই সময়ে শ্রমিক বলতে মূলত কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমিককেই বোঝানো হতো। তখন মালয়েশিয়া এবং পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক রপ্তানি করা হতো। চা-করেরা এই তথ্য অবগত থাকায় নতুন করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের টোপ ফেলে। বিহারের রাঁচি, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগনা, ডুমকা ও গয়া, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, সম্বলপুর ও চাইবাসা এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, রামপুরহাট ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলা থেকে মুখ্যত শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও শ্রমিক সংগ্রহ করার হয়। নেপাল থেকেও একপর্যায়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়।

"১৮৪১ সালের দিকে শ্রমিক পাঠানোর কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ব্রিটিশরা 'ফ্রি কনট্রাক্টরস' পদ্ধতি তৈরি করে। এই আইনের বলে বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কুলি সংগ্রহ করার জন্য চা-করেরা চুক্তি করে স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে। লোভী এজেন্টরা (এদেরই আড়কাঠি বলা হয়) স্থানীয় কিছু ধূর্ত লোককে আড়কাঠি হিসেবে বাছাই করে।"

১৮৪১ সালের দিকে শ্রমিক পাঠানোর কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ব্রিটিশরা 'ফ্রি কনট্রাক্টরস' পদ্ধতি তৈরি করে। এই আইনের বলে বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কুলি সংগ্রহ করার জন্য চা-করেরা চুক্তি করে স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে। লোভী এজেন্টরা (এদেরই আড়কাঠি বলা হয়) স্থানীয় কিছু ধূর্ত লোককে আড়কাঠি হিসেবে বাছাই করে। তারা অধিক মুনাফার আশায় নিজেদের মধ্যে শুরু করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শ্রমিকদের দেখাতে থাকে নানা প্রলোভন। করতে থাকে নানা রকমের মিথ্যাচার। তারা সুসজ্জিত বেশে গিয়ে গ্রামে গ্রামে চা-শ্রমিকদের সুখের জীবনের কথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলত। বলত, চা-বাগানে গাছ নাড়ালে টাকা পড়ে। গরিব গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা

এসব শুনে সুখের স্বপ্ন দেখত। তারপর ওইসব আড়কাঠির হাত ধরে একদিন বাড়ি ছেড়ে পা বাড়াত। ছাগল-গরুর ব্যাবসার মতো শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাবসা তখন জমজমাট। কোনোভাবে তাদের জাহাজের ঘাটে এনে দিতে পারলেই আড়কাঠিরা হাতে পেত কচকচে টাকা।

আড়কাঠিদের কাজ ছিল কুলিদের জাহাজ ডিপোয় এনে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া। একবার স্বাক্ষর করাতে পারলেই শ্রমিকরা চা-মালিকদের জিম্মায় চলে যেত। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আদর-আপ্যায়ন ভালোই হতো। হাতবদলে তারা এসে পড়ত জাহাজের কর্তৃপক্ষের কাছে। শুরু হতো তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ। কুলিদের জন্য তো আর জাহাজের বাড়তি জায়গা জোগান দেওয়া যাবে না, তাই ছাগল-গরুর মতো তাদের জাহাজে ওঠানো হতো। জাহাজের ধারণক্ষমতা যেখানে ২০০ জন, সেখানে তোলা হতো ১০০০-১২০০ জন।

"কুলিদের জন্য তো আর জাহাজের বাড়তি জোগান দেওয়া যাবে না, তাই ছাগল-গরুর মতো তাদের জাহাজে ওঠানো হতো। জাহাজের ধারণক্ষমতা যেখানে ২০০ জন, সেখানে তোলা হতো ১০০০-১২০০ জন।"

শুয়ে থাকা তো দূরের কথা বসার মতোও কোনো স্থান ছিল না। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাদের দিন কাটাতে হতো। খাবার দেওয়া হতো খুবই কম, যতটুকু না দিলেই নয়। জাহাজে ভ্রমণের ধাক্কার সঙ্গে যোগ হতো রোগবালাই। কলেরা-বসন্ত মহামারিরূপে দেখা দিত। তাদের জন্য জাহাজে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তা কেউ মনে করেনি। কাতারে কাতারে লোক জাহাজে মারা যেত। জাহাজ এসে ভিড়ত বদরপুর বা কাঠিগড়ায় (আগে এই দুটিই ছিল জাহাজবন্দর)। জাহাজ যখন খালাস করা হতো, তখন অর্ধেক নামত জীবন্ত আর অর্ধেক লাশ হয়ে। রোগ বিস্তারের অজুহাতে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো পানিতে। শ্রমিকরা দেখত তাদের চোখের সামনেই সৎকারবিহীন ভাই, বাবা, চাচা, বন্ধুর লাশ পানিতে ফেলা হচ্ছে ঝুপঝাপ শব্দ করে।

যারা বেঁচে থাকল তাদের নিয়ে আসা হলো শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে। যে সুখের দিনের কথা তারা চিন্তা করে জাহাজে উঠেছিল, তা খুব দ্রুতই মিলিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গলেই তাদের থাকতে হবে। এখানেই কাজ করতে হবে। মারতে হবে সাপ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, বিষাক্ত পোকামাকড় অথবা তাদের হাতেই হবে তাদের মৃত্যু। জীবজন্তুর সঙ্গে এবং জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে কমে যেতে থাকে তাদের সংখ্যা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর তাদের নিত্যসঙ্গী। চিকিৎসা বলতে কোনো ব্যাপার তখন শ্রমিকদের জন্য ছিল না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চা চাষের জন্য ১৮৬৩-১৮৬৬ সালে এ অঞ্চলে ৮৪,৯১৫ শ্রমিক আনা হয়, যার মধ্যে অনাহারে-অর্ধাহারে, অসুখে-বিসুখে ৩০,০০০ শ্রমিক মারা যায়।

"নিয়ে আসা হলো শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলে। যে সুখের দিনের কথা তারা চিন্তা করে জাহাজে উঠেছিল, তা খুব দ্রুতই মিলিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গলেই তাদের থাকতে হবে। এখানেই কাজ করতে হবে। মারতে হবে সাপ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, বিষাক্ত পোকামাকড় অথ বা তাদের হাতেই হবে তাদের মৃত্যু। জীবজন্তুর সঙ্গে এবং জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে কমে যেতে থাকে তাদের সংখ্যা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর তাদের নিত্যসঙ্গী।"

অধিকাংশ চা-বাগানের মালিকানা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এই আন্দোলনের কিছুটা বাতাস পায় চা-শ্রমিকরাও। ক্ষুধা, রোগ, জরা, মৃত্যু, নিজ আপনজন থেকে দূরে থাকা এবং আদৌ ফিরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।

তখন ১৯২০ সাল। শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বাগান থেকে বাগানে। বিদেশি মালিকদের সব রকমের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও চা-বাগান বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো শ্রমিক আন্দোলনের হাল ধরার মতো বলতে গেলে কেউ ছিল না। অদক্ষভাবে আন্দোলন গড়াতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তারাও চা-বাগান থেকে বের হয়ে আসে। ১৯২১ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও গণজাগরণ চা-শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করে। এ সময় থেকে চা-শ্রমিকদের শোষণবিরোধী সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় শক্তি সংগ্রামের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। চরাঞ্চলের চা-শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চা-বাগান থেকে বের হয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে রেলপথ ধরে হাঁটতে থাকে। এই চা-শ্রমিক আন্দোলনকে 'চরগোলা এক্সোডাস' বলা হয়।

সিলেট ও কাছাড়ের প্রায় ত্রিশ হাজার চা-শ্রমিক এ অন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের দাবি ছিল একটি-ইংরেজ মালিকদের অধীন কাজ করবে না। তাদের নিজের আবাসভূমিতে (মুল্লুকে) ফিরে যাবে। ১৯২১ সালের ৩ মার্চ অনিপুর চা-বাগান থেকে ৭৫০ জন শ্রমিক বেরিয়ে এলে শ্রমিকদের মধ্যে বাগান ছাড়ার তৎপরতা দেখা যায়। দলে দলে শ্রমিকরা বাগান থেকে বের হতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই-নিজের মুল্লুকে ফিরে যাওয়া। সে সময়কার অসহযোগ আন্দোলন তাদেরকে পুরোনো গ্রামের সেই কথা আবার মনে করিয়ে দেয়। চা-শ্রমিকরা বুঝতে পারে,

চা-মালিকরা প্রতারণা করে তাদেরকে জঙ্গলে বন্দি করে রেখেছে। সোনালি অতীতে ফিরে যাওয়ার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস তারা অনুভব করে। পাগলের মতো কোনো চিন্তা না-করে বেরিয়ে যায় মাথা গোঁজার ঠাঁই ছেড়ে। কীভাবে যাবে, কী খাবে-এসব চিন্তা তাদের একটিবারের জন্যও থামাতে পারেনি। তারা বেরিয়ে পড়ে অজানা গন্তব্যে।

"১৯২১ সালের ৩ মার্চ অনিপুর চা-বাগান থেকে ৭৫০ জন শ্রমিক বেরিয়ে এলে শ্রমিকদের মধ্যে বাগান ছাড়ার তৎপরতা দেখা যায়। দলে দলে শ্রমিকরা বাগান থেকে বের হতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই-নিজের মুল্লুকে ফিরে যাওয়া।"

কী হবে আর থেকে-এখানেও তো ধুঁকে ধুঁকে মরছি-তো একবার বেরিয়ে দেখি-না কী হয়। বন্দিজীবনের কারণে তাদের বাহিরের পৃথিবীটাও ছিল অপরিচিত। এই অপরিচিত পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হাত ধরে। কীভাবে যাবে? রাস্তাঘাট চিনবে কী করে? তারা তো শুধু চেনে চাঁদপুর জাহাজঘাট। সেখানে যেতে পারলেই জাহাজে চড়ে বাড়ি ফেরা যাবে। জাহাজঘাট যাবে কী করে? সবাই জড়ো হতে থাকে রেলস্টেশনে। তখন চা-বাগান মালিক ব্রিটিশরা শ্রমিকদের রেলের টিকিট না দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু উপায় খুব সহজে বের হয়-হাঁটা। এই রেললাইল ধরেই হাঁটা। সবাই সেই রেললাইল ধরেই হাঁটতে থাকে চাঁদপুর জাহাজঘাটের উদ্দেশ্যে। এই আন্দোলন 'মুল্লুকে চলো' আন্দোলন হিসেবে বেশি পরিচিত। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হাজার হাজার শ্রমিক এসে জড়ো হয় জাহাজঘাটে। জনপ্রিয় নেতা হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে এদের জন্য চিড়া ও চালের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের রান্না করার মনোবল এবং শক্তি কোনোটাই ছিল না। তারা কাঁচা চাল চিবিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। যখনই স্টিমার ঘাটে এসে ভেড়ে, অমনি প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে স্টিমারে উঠতে ব্যস্ত হয়ে যায়। জাহাজ কর্মচারীরা চায় টিকিট। টিকিট কাটতে লাগে টাকা, চা-শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোথায় পাবে টাকা? কোথায় টিকিট? অনেক অনুনয়-বিনয় করেও জাহাজকর্মীদের মন টলানো যায় না। একপর্যায়ে জাহাজকর্মীদের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে উঠতে গিয়ে ঝপাঝপ পড়ে পানিতে। পরিস্থিতির ওপর সরকারেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাই প্রস্তুত রেখেছিল পুলিশবাহিনী। হুইসেল বাজতেই একদল সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসে। জাহাজের সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। জাহাজের সিঁড়ি থেকে শ্রমিকদের রক্তাক্ত দেহ পড়তে থাকে পানিতে। শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অল্প সময়েই জাহাজঘাট শূন্য হয়ে যায়।

"যখনই স্টিমার ঘাটে এসে ভেড়ে, অমনি প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে স্টিমারে উঠতে ব্যস্ত হয়ে যায়। জাহাজ কর্মচারীরা চায় টিকিট। টিকিট কাটতে লাগে টাকা, চা-শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোথায় পাবে টাকা? কোথায় টিকিট? অনেক অনুনয়-বিনয় করেও জাহাজকর্মীদের মন টলানো যায় না।"

এই আক্রমণে কতজন শ্রমিক নিহত হয়েছিল, কতজন আহত হয়েছিল-তার কোনো হিসাব নেই। লোকজন শুধু নদীতে লাশের সারি ভেসে যেতে দেখেছে। সবচেয়ে পাশবিক ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদপুর রেলস্টেশনে। রেলওয়ে ইয়ার্ডে তিন-চার হাজার শ্রমিক জড়ো হয়েছিল। ২০ মে তাদেরও জাহাজঘাটে পৌঁছানোর কথা। রাতের অন্ধকারে গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যরা রেলওয়ে ইয়ার্ড ঘিরে ফেলে। সরকারপক্ষ থেকে নিষিদ্ধ এলাকায় কোনো লোকজনকে যেতে নিষেধ করা হয়। সরলপ্রাণ ক্লান্ত শ্রমিকরা রহস্যটা বুঝতে পারেনি। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, কমিশনার কে.সি দে-র নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রমিকদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে অনেক লাশ গুম করে ফেলে গুর্খা বাহিনী। এখানেও কতজন নিহত, কতজন আহত হয়েছে-তারও কোনো হিসাব করা হয়নি। বাগান মালিকরা ভেবেছিল, ত্রাসের সঞ্চার করে তাদের আবার বাগানে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাই একটি অতিরিক্ত কামরাসহ রেলগাড়ি স্টেশনে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য খুব একটা সফল হয়নি। আক্রমণের ফলে পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকরা। মাড়োয়ারি পাট ব্যবসায়ীরা তাদের পাটের গুদামে এবং মানুষজন তাদের বাড়িঘরে আশ্রয় দেয়।

"২০ মে তাদেরও জাহাজঘাটে পৌঁছানোর কথা। রাতের অন্ধকারে গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যরা রেলওয়ে ইয়ার্ড ঘিরে ফেলে। সরকারপক্ষ থেকে নিষিদ্ধ এলাকায় কোনো লোকজনকে যেতে নিষেধ করা হয়। সরলপ্রাণ ক্লান্ত শ্রমিকরা রহস্যটা বুঝতে পারেনি। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, কমিশনার কে.সি দে-র নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রমিকদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে অনেক লাশ গুম করে ফেলে গুর্খা বাহিনী।"

চাঁদপুরে চা-শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডাকা হয় হরতাল। রেল ও জাহাজ কোম্পানির কর্মীরা এই হরতালে সমর্থন জানায় এবং প্রতিবাদ

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘট পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয়ও ছড়িয়ে পড়ে। রেল কর্মচারীদের এই ধর্মঘট আড়াই মাস স্থায়ী হয় এবং ৪৫০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হয়। জাহাজকর্মীদের ধর্মঘট চলে ছয় সপ্তাহ। এদিকে চা-শ্রমিকদের খাদ্য জোগানোর জন্য হারাধন নাগের নেতৃত্বে রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়। জনসাধারণ উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায়। একপর্যায়ে সরকার শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ করতে চাইলে শ্রমিকরা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিছুদিন পরেই শ্রমিকদের মধ্যে কলেরা মহামারি আকারে দেখা দেয়। বহু শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। রেলস্টেশন থেকে পণ্ডিত গঙ্গা দয়াল দীক্ষিতসহ নেতৃস্থানীয় শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। জেলখানা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে পণ্ডিত গঙ্গা দয়াল দীক্ষিত অনশন করে প্রাণ বিসর্জন দেন। তারপর কী হয়? তারপর রাজনীতি। ছেলেভুলানো চার দফার আপসের মাধ্যমে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে:

১) এ মর্মান্তিক ঘটনার পরও যেসব শ্রমিক নিজ মুল্লুকে যেতে একান্ত ইচ্ছুক, কোম্পানি তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

২) কিছু কংগ্রেস কর্মী গিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

৩) বাকিরা আসামে ফিরে গিয়ে আবার কাজ পাবে।

৪) কোম্পানি তাদের কাজ পেতে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

“চাঁদপুরে চা-শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডাকা হয় হরতাল। রেল ও জাহাজ কোম্পানির কর্মীরা এই হরতালে সমর্থন জানায় এবং প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘট পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয়ও ছড়িয়ে পড়ে। রেল কর্মচারীদের এই ধর্মঘট আড়াই মাস স্থায়ী হয় এবং ৪৫০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হয়। জাহাজকর্মীদের ধর্মঘট চলে ছয় সপ্তাহ।“

বর্তমান পরিস্থিতি

উপরের ঘটনাটি হলো ব্রিটিশ আমলের; কিন্তু আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে চা-শ্রমিকরা কেমন আছে, তা নিচের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে:

বাংলাদেশের ২৪১টি (ফাঁড়িসহ) চা-বাগানে প্রায় ১৫ লাখ চা জনগোষ্ঠী ১৮০ বছর ধরে বসবাস করছে। যদিও এই চা-শ্রমিকরা বাংলাদেশের নাগরিক; কিন্তু পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। চা-শিল্পের মাধ্যমে এই চা-শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে; অথচ তাদের জীবনমান উন্নয়নে কোনো ধরনের সরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি নিজ জমির কোনো দলিল-দস্তাবেজ না-থাকায় তাদের বসতভিটা ও কৃষিজমি প্রতিনিয়ত দখল হচ্ছে। এই লেখার মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকারসহ তাদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চা-বাগানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য। তাদের দৈনিক মজুরি এত কম যে, এই মজুরিতে কর্মরত শ্রমিকদের পরিবারসহ দারিদ্র্যসীমার নিচেই বসবাস করতে হয়। অথচ চা-শ্রমিকের দারিদ্র্যের বিষয়টি পিআরএসপি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। যার ফলে দেশের চা-শ্রমিকদের সমন্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থা ছিটকে পড়ছে।

“চা-বাগান অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম। যেসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, তারা কাজ করে চা-বাগানে। ২৪১টি চা-বাগানের মধ্যে কোনোটিতে কলেজ নেই, হাইস্কুল রয়েছে মাত্র দুটি, আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে হাতে গোনা কয়েকটি। একদিকে যেমন ৫-৬ কিলোমিটার হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়, অন্যদিকে শারীরিক গঠন ও ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা মূলধারার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হয়।“

চা-বাগান অঞ্চলে শিক্ষার হার খুবই কম। যেসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, তারা কাজ করে চা-বাগানে। ২৪১টি চা-বাগানের মধ্যে কোনোটিতে কলেজ নেই, হাইস্কুল রয়েছে মাত্র দুটি, আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে হাতে গোনা কয়েকটি। একদিকে যেমন ৫-৬ কিলোমিটার হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়, অন্যদিকে শারীরিক গঠন ও ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা মূলধারার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হয়। যে কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই অনেক শিশু ঝরে পড়ে। দেশের অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন কোটা সুবিধা রয়েছে, চা-জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোনো বিশেষ কোটা ব্যবস্থা নেই। অথচ চা জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের চা বোর্ডের হিসাবমতে, স্থায়ী চা-শ্রমিকের সংখ্যা ১,৪০,০০০ জন (বাংলাদেশ চা বোর্ড, ৪ জুন ২০২১) অথচ মাত্র ৯৩৫০০ চা-শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাচ্ছে (সূত্র: প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের সিটিজেন চার্টার)। শ্রম আইন অনুযায়ী, যেখানে তিন মাস কাজ করার পর একজন চা-শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার অধিকার রাখে, সেখানে ২০-২৫ বছর কাজ করার পরও প্রায় ২৫০০০০ চা-শ্রমিককে অস্থায়ী রাখা হচ্ছে, যারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা থেকে।

“শ্রম আইন অনুযায়ী যেখানে তিন মাস কাজ করার পর একজন চা-শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার অধিকার রাখে, সেখানে ২০-২৫ বছর কাজ করার পরও প্রায় ২৫০০০০ চা-শ্রমিককে অস্থায়ী রাখা হচ্ছে, যারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা থেকে।“

চা-বাগানগুলোয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার মানের অবস্থা খুবই নাজুক। কারণ, এখানে স্বাস্থ্যসেবার নামে চলে রসিকতা। অধিকাংশ চা-বাগানে হাসপাতাল নেই। আবার হাসপাতাল থাকলে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি নেই। এই নেই নেই-এর মধ্যে চলছে বাগানগুলোর স্বাস্থ্যসেবা। অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী না-থাকায় চা-বাগানগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৬২ সালের টি প্ল্যান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের প্ল্যান্টেশন রুলসে চা-বাগানগুলোয় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব থ াকলেও তা করা হচ্ছে না। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া প্রভৃ তি চা-শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

বর্তমানে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ১৭০ টাকা। সম্প্রতি দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বেসরকারি খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশের চা-শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৬৫০-১০০০ টাকা অথচ বাংলাদেশের চা-শ্রমিকরা পাচ্ছে মাত্র ১৭০ টাকা। স্বল্প মজুরিপ্রাপ্ত এই চা-শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না বলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

চা-শ্রমিকরা প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম চা-বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। চা-বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। চা-শ্রমিকরা ৮/১২ ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে; যা পুরো মানবসভ্যতার জন্য লজ্জাজনক। একটি ঘরে তিন প্রজন্ম বাস করা যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি মানহানিকর ওই ঘরের সবার জন্য, সমাজের জন্য তো বটেই। এতে বাগানের শিশুদের আত্মসম্মান ও মানসিক বিকাশ হচ্ছে না।

“চা-শ্রমিকরা প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম চা-বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। চা-বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। চা-শ্রমিকরা ৮/১২ ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে;”

দেশের বেশিরভাগ চা-বাগান পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে কূপ খনন বা নলকূপ স্থাপন তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। যার কারণে চা-শ্রমিকরা গাং বা ঝরনার পানি পান করে। চা-শ্রমিকরা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের বাসিন্দা। বিদ্যুৎ-সংযোগ না-থাকায় চা-শ্রমিকরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে তেমন ধারণা পায় না (টেলিভিশন দেখতে পারে না)। অপরদিকে চা-শ্রমিকের সন্তানরা কুপি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করে, যা তাদের চোখের জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশের প্রতিটি চা-বাগানেই শিশুশ্রমিক নিয়োজিত আছে, যেখানে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী {অধ্যায় ৩, ধারা-৩৪(১)} শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী (অধ্যায়-২, ধারা-৫) চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কাজে নিয়োগদানের আগে একজন চা-শ্রমিককে নিয়োগপত্র দিতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোনো চা-শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে এ অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। যাদের প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, পূজা-অর্চনা, বিবাহ প্রথা, সমাজ কাঠামো দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নৃ-তাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে চা জনগোষ্ঠীর কেউ প্রাক-দ্রাবিড়ীয়, কেউ আদি অষ্ট্রালয়েড, কেউবা মঙ্গোলীয় আদিবাসীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়-ই-নি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বরং এদের অন্তর্ভুক্ত করলে এরা দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারত এবং নিজেদের দুরবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারত।

“বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়-ই-নি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত।“

চা চাষের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদে ১,১১,৬৬৩.৮৩ হেক্টর জমি লিজ মঞ্জুর করা হয়, যার ৫১.১১ শতাংশ জমিতে চা চাষ করা হয়। একরপ্রতি বাৎসরিক লিজের পরিমাণ ৫০০ টাকা। অপরদিকে প্রতি একর

কৃষিজমি ব্যবহারের জন্য চা-শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে তিন কেজি রেশন কর্তন করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক এই লিজ দেখভাল করেন।

চা-শ্রমিকরা দীর্ঘ ১৮০ বছর ধরে চা-বাগানে বসবাস করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা ভূমির অধিকার পায়নি-তারা যেন 'নিজভূমে পরবাসী'। চা-শ্রমিকদের ভূমির কোনো দলিল-দস্তাবেজ না-থাকার কারণে তাদেরকে নিম্নরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়:

* বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ জরুরি হওয়া সত্ত্বেও ভূমির দলিল-দস্তাবেজ না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকদের কোনো ধরনের ঋণ দেওয়া হয় না। যার ফলে চা-শ্রমিকদের পক্ষে বৃহত্তর ব্যাবসার উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষিকাজে বিনিয়োগ ইত্যাদি করা সম্ভব হয় না।

* চা-বাগান মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ঘর (৮ ফুট/১২ ফুট) ব্যতীত ঘর নির্মাণ করতে চাইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া হয় না। ভূমির অধিকার না-থাকার কারণে এ সমস্যা হচ্ছে।

* ভূমি অধিকার না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জমি দখলের শিকার হচ্ছে। সরকার, চা-বাগানের মালিক, প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে সাধারণত চা-শ্রমিকরা জমি দখলের শিকার হয়।

* ভূমি অধিকার না-থাকার কারণে চা-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জমি দখলের শিকার হচ্ছে। সরকার, চা-বাগানের মালিক, প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে সাধারণত চা-শ্রমিকরা জমি দখলের শিকার হয়। চান্দপুর-বেগমখান চা-বাগানের ১২৫০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমি দখল করে সরকার 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' করছে। এই জমি দখল করার আগে সরকার চা-শ্রমিক পরিবারগুলোকে কোনো ধরনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেনি। তার কারণ, চা-শ্রমিকদের ওই জমির কোনো কাগজপত্র নেই। এখন পর্যন্ত (১৮ জুন ২০২১) এই 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যে কারণে এখনো চাঁন্দপুর-বেগমখানের মানুষ জমি হারানোর আশঙ্কার মধ্যে দিনযাপন করছে।

"চান্দপুর-বেগমখান চা-বাগানের ১২৫০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমি দখল করে সরকার 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' করছে। এই জমি দখল করার আগে সরকার চা-শ্রমিক পরিবারগুলোকে কোনো ধরনের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেনি।"

* লাখাই চা-বাগানের ৭০টি চা-শ্রমিক-পরিবারের প্রায় ১০০ একর কৃষিজমি দখল করে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চা-গাছ লাগানো হয়েছে।

* লাক্কাতুরা চা-বাগানের চা-শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ না-দিয়েই তাদের জমিতে প্রভাবশালী মহল কর্তৃক নির্মিত হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। জমি দখলের এ রকম চিত্র প্রায় প্রতিটি চা-বাগানেই দেখা যায়।

* কোনো চা-শ্রমিক-পরিবার চা-বাগানে কাজ না-করলে তাকে চা-বাগান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। নিজভূমে পরবাসী এই চা-শ্রমিকরা চার প্রজন্ম ধরে বসবাস করেও চা-বাগান থেকে তথাকথিত 'কালো আইন' নামে উচ্ছেদ হচ্ছে।

যাহোক, ১৯২১-২০২১ 'মুল্লুকে চলো আন্দোলন'-এর ১০০ বছর পূর্তি হলেও চা-শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন পরিসমাপ্তি ঘটেনি এখনো। প্রতিনিয়ত চা-শ্রমিকদের ব্রিটিশি কায়দায় শোষণ-শাসন করা হচ্ছে এবং বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে।

তাই, এই ঐতিহাসিক 'মুল্লুকে চলো আন্দোলন'-এর ১০০ বছর পদার্পণে আমরা চা কোম্পানি ও সরকারের কাছে নিম্নোক্ত ২৪ দফা (মৌলিক) দাবি পেশ করছি:

১. ২০ মে 'চা-শ্রমিক দিবস' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে এবং দেশের প্রতিটি চা-বাগানে এই দিবসটি পালনের জন্য মজুরিসহ ছুটি ঘোষণা করতে হবে;

২. চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা ঘোষণা করতে হবে;

৩. জাতীয় বাজেটে চা-শ্রমিকদের জন্য পৃথক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৪. চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৫. করোনাকালীন চা-শ্রমিকদের ঝুঁকিভাতা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন প্রদান, আক্রান্ত শ্রমিককে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হোক;

৬. ৩২, ১১৫ ও ১১৭ ধারাসহ শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সব ধারা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে;

৭. উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে চা-শ্রমিকের সন্তানদের জন্য 'কোটা' সুবিধা চালু করতে হবে।

৮. প্রতিটি চা-বাগানের হাসপাতালগুলোতে নামমাত্র চিকিৎসার পরিবর্তে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে;

৯. চা-বাগানের প্রতি সেকশনে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাসহ গণশৌচাগার ও বিশ্রামাগার থাকতে হবে;

১০. চাপাতা ওজনের জন্য এনালগ মেশিনের পরিবর্তে ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করতে হবে;

১১. প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে চা-শ্রমিকদের ঘরবাড়ির সম্পূর্ণ মেরামত এবং প্রতিবছর কমপক্ষে ২০টি পাকা ঘর নির্মাণ করতে হবে;

১২. প্রতিটি চা-বাগানে অন্তত চা-শ্রমিক নারীদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাড প্রদান করতে হবে;

১৩. শ্রমিকদের (যাতায়াতের সেকশনগুলো) জন্য অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

১৪. চা-বাগানের প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতিসহ তাদের ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫. বন-জঙ্গল-পাহাড় ধ্বংস করে চা চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে;

১৬. চা-বাগানের চৌকিদারদের (দিন ও রাত উভয়কেই) সুরক্ষাসামগ্রী এবং চা-শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন: জুতা-স্যান্ডেল-ছাতা-দা-কোদাল ইত্যাদি যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করতে হবে;

১৭. শ্রমিকদের ঘর নির্মাণের নামে নির্বিচারে চা সেকশনের গাছ কাটা ও বিক্রয়বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে;

১৮. নামমাত্র রেশনের পরিবর্তে শ্রমিকের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব খাদ্যদ্রব্য 'প্রাসঙ্গিক রেশন' হিসেবে প্রদান করতে হবে;

১৯. কীটনাশক স্প্রেয়িং সেকশনে কর্মরত শ্রমিকদের উচ্চহারে ঝুঁকিভাতা প্রদানসহ তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান করতে হবে;

২০. স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয়কেই সমান হারে মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে;

২১. যথাসময়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় টাকা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট সব অনিয়ম দূর করতে হবে;

২২. যেহেতু রাবার চাষ ও এর প্রক্রিয়াকরণ পরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই চা-বাগানে রাবার চাষ বন্ধ করতে হবে;

২৩. চা-বাগানের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে;

২৪. চা-বাগানে সব ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রয় বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মোহন রবিদাস
এ্যাডভোকেসি অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ
rdmohan.nu@gmail.com